বর্ষসাহেবের মেয়ে

বিমল কর

ভারতী গ্রন্থভবন
৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট
শ্রীঅহিভূষণ মালিক

১৫ই আগষ্ট ১৯৫২

—দাম দু টাকা—

উৎসর্গ

শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ

বন্ধুবরেষু

এই লেখকের লেখা বই

হ্রদ

ঝড় ও শিশির

পিয়ারীলাল বার্জ

পিয়ারীলাল বার্জ।

নামের চেয়ে মানুষটা আরো অদ্ভুত। রেভারেণ্ড মণ্ডলের চিঠি নিয়ে ও এসেছিলো ডলবি সাহেবের কাছে। ডলবি সাহেব মধুবন কোলিয়ারীর ডাকসাইটে ম্যানেজার। ম্যানেজারের খাস কামরায় চিঠি পাঠিয়ে দিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় পা ছড়িয়ে বসে পড়লো পিয়ারীলাল। খড়ের ছাউনী করা বাড়ি। দেওয়ালের অর্ধেকটা সাদা চুনকাম করা, বাকি নীচের অর্ধেক আলকাতরা মাখানো। অফিসের সামনে তেঁতুলগাছের ছায়ার তলায় খান দুয়েক গাড়ি দাঁড় করানো রয়েছে। বসে থাকতে থাকতে পিয়ারীলালের নেশা চড়ে ওঠে। থমথমে, চুপচাপ—নিরিবিলি দুপুর। ঘুঘু ডাকছে। মাঝে মাঝে দূর কারখানা থেকে লোহা পেটার শব্দ আসছে ভেসে।

পিয়ারীলাল সবেমাত্র নতুন করে একটা পাশিংশো ধরিয়েছিলো। ছুঁড়ে ফেলে দিলো সিগারেট। মাউথ অর্গান বের করে বাজাতে লাগলো পরমানন্দে। ডলবি সাহেবের দ্বারোয়ান গিয়েছিলো পাশের অফিসে কী কাজে। ফিরে এসে পিয়ারীলালের কাণ্ড দেখে তার চক্ষুস্থির। মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে ছুটে এলো রামব্রিজ: হায়রে বাপ, বড়া-সাহেব কা নিদ টুট যানে সে নোকরি চালা যায়গা। আরে এ সাহেব…! রামব্রিজ

পিয়ারীলালের পাশে এসে রক্তচক্ষু, উগ্রকণ্ঠ হলো। তাতে অবশ্য কিছু এলো গেলো না পিয়ারীলালের।

গণ্ডগোল একটা পাকিয়ে উঠছিলো। হঠাৎ পর্দা সরিয়ে স্বয়ং ডলবি সাহেব বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

বড় সাহেবের গলা শুনে রামব্রিজ সাত পা লাফিয়ে সরে গিয়ে সেলাম ঠুকলো। ইঙ্গিতে পিয়ারীলালকে ডেকে বড় সাহেব আবার পর্দার অন্তরালে অদৃশ্য হলেন।

পিয়ারীলাল মাউথ অর্গানটা পকেটে পুরে গা হাত পা একটু ঝেড়ে নিলো। গলা থেকে রোমালটা খুলে মুখ মুছলো। তারপর নিঃসংকোচ, দ্বিধাহীন পদক্ষেপে এগিয়ে গেলো শিস্ দিতে দিতে।

ঘরে ঢুকে পিয়ারীলাল দেখে কোণের একটা আর্ম-চেয়ারে ডলবি সাহেব গা এলিয়ে শুয়ে রয়েছেন। পাশে টিপয়ের ওপর খান কয়েক প্লেট, কাঁচের ছোট কুঁজো আর বিয়ারের বোতল। আর্ম-চেয়ারের হাতলের ওপর শূন্য গেলাস।

দুপুরে লাঞ্চ শেষ করে ডলবি সাহেব বিশ্রাম নিচ্ছিলেন।

পিয়ারীলাল ঢুকতেই ডলবি সাহেব চোখের পাতা বন্ধ রেখেই হাঁকলেন, 'প্লে অন্...!'

হকচকিয়ে গেলো পিয়ারীলাল। ব্যাপারটা বুঝে উঠতে সময় লাগলো খানিকটা। তারপর একটানা বিশ মিনিট কী তারও বেশি পিয়ারীলাল মাউথ অর্গান বাজালো ডলবি সাহেবের অফিসে, তাঁরই সামনে দাঁড়িয়ে। পর্দার বাইরে চুপিসারে কম-সে-কম এক ডজন এ্যাসিস্টেণ্ট আর বাবুর দল ভিড় করে

পরম বিস্ময়কর ব্যাপারটা অনুধাবনের জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকলো।

পিয়ারীলাল থামলে ডলবি সাহেব খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে চুপ করে থাকলেন। শেষে চোখ মেলে পিয়ারীলালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রেভারেণ্ড লিখেছেন, তুমি ভালো ফুটবল খেলতে পারো—'

বড় সাহেবের কথা শেষ হয় নি, পিয়ারীলাল প্যাণ্টের পকেট থেকে মুঠো করে একগাদা মেডেল বের করে আর্ম-চেয়ারে হাতলের ওপর রেখে এক অদ্ভুত ভঙ্গিমায় ঘাড় নাচিয়ে নাচিয়ে হাসলো। অর্থটা এই—তুমি দেখো আরো কতো ম্যাজিক জানে পিয়ারীলাল।

মেডেলের দিকে একটু তাকিয়ে ডলবি সাহেব এবার বললেন—'কিন্তু তুমি কোনো কাজ জানো না।'

পিয়ারীলাল মাথা নাড়লো। না, জানি না।

ডলবি সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেন পিয়ারীলালকে মেডেলগুলো তুলে নিতে।

মেডেলগুলো তুলে পকেটে পুরলো পিয়ারীলাল।

—তোমায় আমি উপস্থিত একটা চাকরি দিচ্ছি, মাষ্টার বার্জ। এই সিজনে কোলফিল্ড্ টুর্নামেন্টের 'রাজ শিল্ড' আমার কোলিয়ারীতে আসা চাই। যদি শিল্ড আনতে পারো, চাকরি থাকবে, না হলে তাড়িয়ে দেবো—। মাইণ্ড ছ্যাট!

পিয়ারীলাল ছোট ছোট চোখ করে মুখ ফুলিয়ে হাসলো। তার মুখের ভাবটা এমন, এ আর কি নতুন কথা!

ডলবি সাহেব টেবিলের সামনে গিয়ে চেয়ারের মধ্যে ডুবে বসলেন।

—বাইরে অপেক্ষা করো। অফিস থেকে তোমায় চিঠি দেবে।

পিয়ারীলাল তার সাবেক রীতিতে দু'পা পিছিয়ে এসে নড্ করার ভঙ্গী করে বললে, 'থ্যাঙ্ক্ য়ু—স্যার।'

পিয়ারীলাল সেই থেকে মধুবন কোলিয়ারীতে।

মধুবন কোলিয়ারীর হয়ে 'রাজ শিল্ড্, সত্যি সত্যিই ও জিতে আনলো। সারাটা সিজ্ন্ পাগলা-ঘোড়ার মতন একাই এগারোজনের খেলা খেলে তাক লাগিয়ে দিলো ও সকলকে। আর সেই থেকে ডলবি সাহেব বার্জ বলতে অজ্ঞান। পিয়ারী-লালের আগে কাজ ছিলো এ্যাসিস্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার সেনগুপ্ত সাহেবের অফিস দেখা। কাজটা বেয়ারাদের কাজের মতনই। শিল্ড্ জিতে আনার পর সেনগুপ্ত সাহেব ওর পিঠ চাপড়ে বললেন—'পিয়ারীলাল, তুমি আমাদের ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন। তোমায় একটা অনারেবল্ পোস্ট দিতে হয়। দাঁড়াও, দেখি একটা ব্যবস্থা করি—'।

ব্যবস্থাও হলো একটা। পিয়ারীলালের জন্যে আরও ভালো ব্যবস্থা হতে পারতো। সে চেষ্টাও করেছিলেন সেনগুপ্ত সাহেব। দুঃখের বিষয়, তাতে উল্টো ফল ফললো। পিয়ারীলাল সব পারে—পারে না শুধু মাথার কাজ। অসম্ভব রকমের বোকা ও—সতবার একটা কাজ শিখিয়ে দিলে উনপঞ্চাশবার ভুল করে বসবে। তার ওপর মাথায় বেশ একটু ছিট আছে। এক

করতে এক করে বসে—এক বলতে এক বলে ফেলে। ভেবে-চিন্তে পিয়ারীলালকে তাই এমন কাজ দেওয়া হলো, যাতে মাথার কাজ তো দূরের কথা, হাতের কাজও করতে না হয়।

কয়লা বোঝাই হবার জন্যে খালি মালগাড়িগুলো এসে দাঁড়ায় তিন নম্বর পিটের সামনে। পিটটা আজ আট-দশ বছরের বেশি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। ওর প্রতি সকলের অবজ্ঞা। পাশেই ভাঙা ইঞ্জিনঘরটার সব ক'টা টিন অনেক আগেই উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে যাবতীয় যা কিছু কাজে আসতে পারে।

পিয়ারীলালকে এখানে জুতে দেওয়া হলো। এই ভগ্ন, জীর্ণ তিন নম্বর পিটের মুখেই ওর কাজ। কাজটা অবশ্য খাটুনির নয়—কিন্তু বড়ই একঘেয়ে। সকাল আটটা থেকে বেলা বারোটা। তারপর আবার একটা থেকে বিকেল পাঁচটা—যতক্ষণ না পাওয়ার হাউসের গলাভাঙ্গা সিটিটা বেজে ওঠে। পিয়ারীলালের একটা চিট্ ময়লা খাতা আছে। সেই খাতায় রোজ ওকে কয়লা বোঝাই হবার পর মালগাড়িগুলোর নম্বর টুকে রাখতে হয়। বিকেলে যাবার সময় অফিসে গিয়ে একবার শুধু জানিয়ে দেওয়া—সারাদিনে কটা মালগাড়ি বোঝাই হলো। পরের দিন পিয়ারীলাল এসে দেখে স্টেশন থেকে ইঞ্জিন এসে বোঝাই গাড়িগুলো টেনে নিয়ে গেছে। কিংবা অন্য একটা সাইডিংয়ে রেখে খালি গাড়ি লাগিয়ে দিয়ে গেছে লাইনে।

সকাল-বিকেল পিয়ারীলালের এই কাজ—হাঁ করে গাড়ি বোঝাই দেখা।

নতুন জায়গায় এসে দিন কয়েক যেতে না যেতেই পিয়ারীলাল সোজা একদিন সেনগুপ্ত সাহেবের কাছে গিয়ে বললে, তার একটা অফিস চাই, আর চাই নামওয়বালা পদ। না হলে লোকের কাছে বলবে কি? সেনগুপ্ত সাহেব পিয়ারীলালের গলার স্বরে মুখ তুলে তাকিয়ে প্রায় হেসে ফেলেন আর কী। শেষে বলেন—তোমার পছন্দমত একটা কিছু বানিয়ে নাও। কিন্তু খেয়াল থাকে যেন, ওয়াগন নম্বর টুকতে ভুল না হয়।

—ইয়াস স্যার। এ্যাণ্ড ষ্টিলিং? ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলার ঝোঁক আনলো পিয়ারীলাল তার গলার স্বরে।

—নিশ্চয়। কয়লা চুরি দেখতে হবে বই কি!

পিয়ারীলালকে আর পায় কে। ভাঙ্গা ইঞ্জিনঘরের চারপাশে যতো রাজ্যের আকন্দ আর ফণিমনসা গাছের ঝোপ, কয়লার চাঁই, ভাঙ্গা লোহালক্কড় জমা হয়েছিলো। এরই একটা পাশ নিজের হাতে পরিষ্কার করে দুখানা টিনের জোড় লাগিয়ে পিয়ারীলাল তার অফিস করলো। মিস্ত্রীকে বলে বানালো একটা কেরাসিন কাঠের চেয়ার আর নড়চড়ে টেবিল। তারপর দিব্যি আরামে টেবিলের ওপর পা তুলে বসে পিয়ারীলাল তার অফিস করতে লাগলো।

কুলিকামিন আর কনট্রাক্টাররা ওকে ডাকতে শুরু করলো 'লোডার সাহেব'। পিয়ারীলাল যে বাবু নয়—যতো কালোই হোক, তবু যে সে সাহেব, তা ওরা জানতো। লোকমুখে শুনেছে, পিয়ারীলাল খ্রীশ্চান; আর নিজেরা দেখেছে, পিয়ারীলাল রোববার রোববার দোপাটি ফুল পকেটে গুঁজে, সেজে-গুজে

গির্জেয় যায়। তা ছাড়া পিয়ারীলালের কথা হিন্দী, বাংলা, ইংরিজী—তিন মিলিয়ে সে এক অপূর্ব বস্তু। কাজে কাজেই পিয়ারীলাল বার্জ—লোড়ার-সাহেব না হয়ে যায় কোথায়।

পিয়ারীলাল অফিস ডিসিপ্লিন মানতে আজকাল পছন্দ করে। অন্তত ওকে ডাকার ব্যাপারে। তবে বেচারীকে সারাদিন এক জায়গায় ঠায় বসে থাকতে হয়—উপায় কি—তাই খেয়াল হলেই পকেট থেকে মাউথ অর্গান বের করে বাজায়।

কাজের ফাঁকে অনেকেই পাওয়ার হাউস থেকে পালিয়ে এসে পিয়ারীলালের কাছে বসে। গল্পগুজব করে। বিড়ি-সিগারেট ফোঁকে। বলে—বেড়ে আছো বাবা, পিয়ারীলাল। ধন্যি তোমার পদযুগল। শালা খেলেই এতো, না জানি খেলালে কতো হতো।

পিয়ারী মুচকি মুচকি হাসে।

—নাইস্ প্লেস।

—তা তো বুঝলাম। একদিন সুইচ্‌বোর্ড এ্যটেণ্ডার পঞ্চু সাহানা বললো, 'কিন্তু পিয়ারীলাল, এই কয়লার কুলে বসে বাঁশি বাজিয়ে তুমি নাকি বাবা এক রাধা পাকড়েছো?'

—কিয়া? পিয়ারীলাল চোখ কুঁচকে প্রশ্ন করে।

—রাধা। কেষ্টোর আঁটাকাঠি। ইউ ডোণ্ট নো আঁটাকাঠি? প্রণয়ী গো, ভজা সাহেব। প্রেম বোঝো—লভ্—ওয়াইফ্। পিয়ারী—পিয়ারী বোঝো না, সাহেব; নাম তো এদিকে পিয়ারীলাল।

পঞ্চু সাহানার কথায় পিয়ারীলাল হো হো করে হেসে উঠলো।

—বুঝতে পারছি, পঞ্চা। পিয়ারী বলো, ডার্লিং। ইয়াস্। হামকো এক গার্ল হ্যায়।

—কাঁহা হ্যায়, সাহেব? বিউটিফুল হ্যায়—? পঞ্চু বড় বড় চোখ করে জানতে চায়।

—সিওর। সি ইজ এ কুইন্। পঞ্চা, হাম উসকো ম্যারি করেগা।

—একেবারেই ম্যারি। তুমি তো সাহেব ভালো ফুটবল খেলো—তা ম্যারির আগে একটু কেয়ারী করলে পারতে না?

পিয়ারীলাল কিছু না বুঝেই মাথা নাড়লো।

—তা জাত কি? তোমাদের মত দো-আঁশলা না অন্য কিছু?

—হোয়াট? জাত—? ইয়াস জাত হ্যায়! তুম্‌কো জাত।

—আমার জাত! পঞ্চুর গলা হঠাৎ বুজে এলো। অবাক চোখে পিয়ারীলালের দিকে খানিকটা তাকিয়ে পঞ্চু উঠলো। বললে, 'তুমি শালা সাহেব রাম-বজ্জাত। যাক্, আজ আখড়ায় আসছো তো? রিহার্সল দিতে হবে।'

—সিওর।

পঞ্চু সহসা চলে গেলো। পিয়ারীলাল অকারণে অথবা কি কারণে কে জানে আপন মনে হাসতে লাগলো।

ম্যারি কথাটা মনে থাকে পিয়ারীলালের। মিশনারী 'পুওয়র হোমে' থাকবার সময় স্যামসনকে ম্যারি করতে দেখেছে

পিয়ারীলাল। বেঁটে মোটা মতন দেখতে ছিলো মেয়েটা। নাম ডায়না। স্যামসন আর ডায়না ছাথাপাথরের কাছে খাপরা-ছাওয়া বাড়িটায় থাকতো। পাঁউরুটি বিক্রি করতে যেতো। স্যামসনের অসুখ হলে ডায়না কাঁদতো ; ডায়নার যখন ছেলে হলো, হাসপাতালে স্যামসন পাগলের মত ঘর আর হাসপাতাল করে বেড়িয়েছে। ওরা একসঙ্গে গির্জেয় আসতো, বেড়াতে বেরুতো মাঝে মাঝে। ক্রিষ্টমাসের সময় ওদের কাছে আসতো স্যামসনের বুড়িমা। সেই রাঁচির বুড়ি।

পিয়ারীলালের আপন বলতে সাতকুলে কেউ নেই। আসানসোলে রেলের লোকো অফিসে কাজ করে এ্যালফ্রেড। পিয়ারীলালের দূরসম্পর্কের এক খুড়তুতো ভাই। এ্যালফ্রেড বিয়ে করেছে। তার বউটা পিয়ারীলালকে একদিন অনেক কাঁদিয়েছে। ম্যারি করার পর পিয়ারীলাল তাকে একবার দেখে নেবে।

ম্যারির কথা ভাবতে বসে পিয়ারীলাল তন্ময় হয়ে উঠলো। পঞ্চু সাহানাকে একদিন আমন্ত্রণ জানিয়ে বসলো ও।

—বউ দেখতে কোথায় যেতে হবে, সাহেব ; খাস বিলেতে, না একেবারে সেই স্বর্গে ?

—নো। হিঁয়া পর আ যাও। হাম তোম্‌কো দেখ্‌লায়গা।

—হিঁয়া পর— ! কি সর্বনাশ, এই খাদের সামনে তুমি আমায় বউ দেখাবে ? তারপর দু-চারটে ফষ্টিনষ্টি করে ফেলি, আর ছেলেটার চোখে পড়ে যাক্। ঝাঁটা জান্‌তা হ্যায় সাহেব। সেই ঝাঁটার বাড়ি খেতে হবে তা হলে—। · .

—নো, হাম তোম্‌কো খিলায়গা পঞ্চা ; ইউ কাম্‌।

পঞ্চু সাহানাও মজা পেয়ে বসলো। কানাঘুষোয় শুনেছে ও—পিয়ারীলাল নাকি হারু গোমস্তার বাড়িতে আমদানি করা সুন্দরী একটা মেয়ের সঙ্গে হাসি-মস্করা করে। তাকে মাউথ অর্গান বাজিয়ে শোনায়। শিস্‌ দিয়ে ডাকে। এমনি কতো কি। হারু গোমস্তার বাড়ির সেই মেয়েটি যে কে, পঞ্চু তা জানে না। দেখে নি কোনদিন।

একদিন বেলা দশটা নাগাদ পাওয়ারহাউস থেকে কাজের ফাঁকে পালিয়ে এসে পঞ্চু সাহানা বললে—পিয়ারী, আজ তোমার বউ দেখবো।

পিয়ারীলালের মুখ গম্ভীর। চুপটি করে গালে হাত দিয়ে ও বসেছিলো। তার গলায় ঝোলানো রূপোর ক্রস্‌টা মাঝে মাঝে হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরছে। পুরোপুরি গম্ভীর হয়েই পিয়ারীলাল বললে—নো।

—নো ? অবাক হলো পঞ্চু সাহানা, 'হোওয়াই নো, তুমি না আমার কাছে বাত্‌ দিয়েছো, সাহেব ?'

পিয়ারীলাল পঞ্চুর দিকে সোজাভাবে তাকালো। কি ও দেখছিলো কে জানে। একটু পরে করুণ মুখে পিয়ারীলাল বললে—'পঞ্চু, ডিয়ার হাম্‌কো পসান্দ নেহি করতি—!'

পঞ্চু সাহানা পিয়ারীলালের করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেনো থতমত খেয়ে গেলো। ওর গলার স্বর এমন আশ্চর্য চাপা আর হতাশা-ভরা, যা অন্তত পঞ্চু সাহানা কোনোদিন শুনবে বলে আশা করে নি।

একটু ভেবে নিয়ে পঞ্চু বললে, 'তোমায় পছন্দ করে না? বলো কি সাহেব—, রংটাই যা কয়লার মত কালো তোমার। কিন্তু এমন কেষ্ট-কেষ্ট চেহারা।'

পঞ্চু সাহানা মিথ্যে বলে নি। পিয়ারীলালের রংটাই কালো, কিন্তু ওর পঁচিশ বছরের চেহারার দিকে তাকলে প্রশংসা না করে পারা যায় না। একটু লম্বা হলে কি হয়—ঘাড় থেকে পা পর্যন্ত থাকে থাকে যেখানে যেমনটি মানায়, মাংসপেশী কেউ যেনো সাজিয়ে মানিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। মুখটা ঈষৎ চ্যাপ্টা হলেও চোখের আভায় হাসি ছড়ানো, ঠোঁট দুটো মোটা, পুরু গালে ভাঁজ পড়ে হাসলে। ভীষণ বোকা-বোকা দেখায় তখন।

পিয়ারীলালের মগজে বোধ হয় কল বিগড়েছিলো। বললে পিয়ারীলাল—'দেখো, পঞ্চু—'

কথা শেষ না করেই পিয়ারীলাল পকেট থেকে একজোড়া ক্যারেট গোল্ডের হালকায়দার ইয়ারিং বের করে পঞ্চুর হাতে দিলো। পঞ্চু ভূত দেখার মত অবাক চোখে তাকিয়ে থাকলো পিয়ারীলালের মুখের পানে চেয়ে।

—সাত রুপাইয়ামে মোলা হ্যায়। বাট্ ফর্নাথিং। ডালিং নেহি লিয়া! পিয়ারীর গলায় হতাশা আর ক্ষোভ।

হাতের বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পঞ্চু জবাব দিলো—'তোমার গালে চাঁটি মেরে সাত-সাতটা টাকা ঠকিয়ে নিয়েছে পিয়ারীলাল। ওর দাম হওয়া উচিত দু'টাকা। কিন্তু সাহেব দু'টাকায় কি প্রেম জমে? একটু মোটারকম খসাও।' .

পিয়ারীলাল পঞ্চুর হাত আর মুখের ভঙ্গী থেকে ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়ে সাগ্রহে প্রশ্ন করলো, 'তোম্ বলো, পঞ্চু। ইউ আর মাই ফ্রেণ্ড। ঘড়ি মোলেগা, কিয়া কুর্তি ?'

পঞ্চু সাহানা এবার যেনো বাস্তবিক একটু চটলো। বললে—'তার চেয়ে তোমাদের মাসিপিসিরা পরে সেই বুককাটা একটা ফ্রক কিনে এনে দাও না! শালা বেহেড তো বেহেডই। একটা শাড়ি কিনে এনে দাও, সাহেব; বুঝলে, বেশ রঙচঙে শাড়ি।'

—অলরাইট।

পিয়ারীলালের মুখে এতোক্ষণে হাসি দেখা দিলো।

পঞ্চু সাহানার পরামর্শমত পিয়ারীলাল সেইদিনই বিকেলে সাইকেল চালিয়ে শহরে গেলো। খুঁজে খুঁজে টক্‌টকে লাল রঙের এক আলপাকার শাড়ি কিনলো। আর কিনলো এক-কৌটো পাউডার।

মধুবন ফিরতে সন্ধ্যে উতরে গেলো পিয়ারীলালের। প্রথমে নিজের বাসায় এসে ভালো করে স্নান করলো ও। তারপর সদ্য ধোপার বাড়ির পাট ভাঙ্গা এক ধুতি পরলো মালকোঁচা মেরে। কিছুদিন হলো, পঞ্চুর কাছ থেকে ধুতি পরতে শিখেছে পিয়ারীলাল। গায়ে চড়ালো এক হাতকাটা ছিটের শার্ট। ভালো করে চুল আঁচড়ে মুখ ঘষলো। তারপর বাইরে এসে পানের দোকান থেকে পান কিনে মুখে পুরলো।

সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে যখন তিন নম্বর পিটের সামনে এসে পৌঁছ'লো পিয়ারীলাল্, তখন শেষ আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষ সন্ধ্যা অনেক অন্ধকার ছড়িয়ে দিয়েছে। তিন নম্বর পিটের পাশ দিয়ে

সরু একফালি পথ গেছে মাঠের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে। সেই পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে এসে পিয়ারীলাল দাঁড়ালো সুপারিন-টেন্‌ডেণ্ট সাহেবের বাঙলোর পিছন দিকটায়। কাঁটাগাছের বেড়া দেওয়া কম্পাউণ্ড। একজায়গায় ছোট একটা তারের গেট্। তার পাশেই সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সাহেবের চাকরবাকর থাকবার ধাওড়া।

পিয়ারীলাল আস্তে আস্তে গেট খুলে ভেতরে ঢুকলো। এদিক-ওদিক তাকিয়ে চুপিসারে এসে দাঁড়ালো একটা জানলার কাছে। উঁকি মেরে দেখে, ইলেকট্রিক বাতির আলোয় মেঝেতে মাদুর ছড়িয়ে বসে হারু সিং আফিংয়ের নেশায় ঢুলে ঢুলে সুর করে কি যেন পড়ছে। সুরের টান আর ঢুলে পড়ার তাল মিলে সে এক মনোহর দৃশ্য।

হারু সিংয়ের বয়স হয়েছে। পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে। হাড়-ওঠা চেটালো চেহারা। খালি গায়ে সাদা পৈতেটা কাঁধ থেকে কোল পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা। লম্বা নাকের পাশ দিয়ে ভাঙা গালের অর্ধেকটা চোখে পড়ে। ও হলো কোলিয়ারীর গোমস্তা। শোনা যায়, হারু সিং গোমস্তাগিরি করে বাঁকড়োর দিকে বেশ জমিজমা করে ফেলেছে।

হারু সিং আগে থাকতো আট নম্বর পিটের কাছে। বছর দুয়েক হলো, এসে ডেরা বেঁধেছে সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সাহেবের সার্‌ভেণ্ট্‌স কোয়ার্টারে। তিন নম্বর পিটে কয়লা চুরি যাচ্ছিলো একসময়। হারু সিং সে চুরি বন্ধ করেছে।

দাঁড়িয়ে পিয়ারীলাল হারু সিংকে লক্ষ্য করলে খানিকক্ষণ। তারপর পাশের ঘরটার দিকে সরে এসে খোলা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ধীরে ডাকলো, 'কুশল্‌লা।'

কোন সাড়া-শব্দ নেই। খানিকটা অপেক্ষা করে আবার ও ডাকলো, 'কুশল্‌লা—'

অন্ধকার ঘরে খস্‌খস্‌ করে কিসের একটা শব্দ হলো। একটু পরে জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো কৌশল্যা। অন্ধকারে তাকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু দাগ-ধোয়া শ্লেটের গায়ের মত অস্পষ্ট একটা মুখ।

—বাজ সাহেব—? অন্ধকার থেকে চাপা একটা বিস্ময়-উক্তি শোনা গেলো।

—ইয়েস ডার্লিং। হাম। তোম গোসা কিয়া হ্যায়, কুশল্‌লা—?

কৌশল্যা নিরুত্তর। কী যেনো ভাবছে সে।

একটু পরে খুব আস্তে কৌশল্যা বললে—'একটু দাঁড়াও সাহেব। উ ঘরটা দেখে নি একবার।'

পিয়ারীলাল কৌশল্যার জানালা থেকে সরে এলো হারু সিংয়ের জানলায়। লোকটার মুখ দিয়ে আর স্বর বেরুচ্ছে না—কেমন যেনো বসে বসে গোঙাচ্ছে। কৌশল্যা এলো সেই ঘরে। পিয়ারীলাল দেখলো, কৌশল্যা এসে হারু সিংয়ের পাশে বসেছে। কৌশল্যার দিকে তাকিয়ে চোখের পাতা পড়তে চায় না পিয়ারীলালের। হলদে রঙের লালপেড়ে শাড়ি পরনে। গায়ে দেহাতী খয়রা ছিটের আঁট জামা।

আঁট করে খোঁপা বাঁধা। গলায় হাঁসুলী। রূপ বটে কৌশল্যার। আধ-ফরসা রঙ। আদল-কাটা মুখ। টানা-টানা কালো চোখ আর ঘন ভুরু। নগ্ন বাহু দুটো আলোয় ঘুমন্ত সাপের মতো এলিয়ে রয়েছে। কোমর বেঁকিয়ে, পা ছড়িয়ে বসেছে কৌশল্যা। সে ভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরানো কঠিন।

কৌশল্যা হারু সিংয়ের গায়ে ঠেলা দিলো।

সচকিত হয়ে চোখ চাইলো হারু সিং। তারপর চোখ রগড়ে বিনি বাক্যব্যয়ে সামনের খোলা বইটার দিকে চোখ রেখে পড়তে লাগলো ঃ

গৌতমে তপস্যা করে তমসার জলে।
হেনকালে ইন্দ্র গেলা গৌতমের ঘরে ॥
গৌতমের স্ত্রী হও এ পরম সুন্দরী।
বিধাতা এ সৃজিলেন স্বর্গ বিদ্যাধরী ॥
রূপ দেখি ইন্দ্রদেব অচেতন কামে।
গৌতমের পাশে গেল গৌতম আশ্রমে ॥

হারু সিং সুর করে আগের মত পড়া শুরু করলেও কয়েক লাইন পড়তে পড়তে আবার ঢুলতে সুরু করে।

মাদুর ছেড়ে উঠলো কৌশল্যা। ঘরের কোণ থেকে একটা বালিশ নামিয়ে পেতে দিলো। ছোট্ট একটা কৌটো এনে হাতে দিলো হারু সিংয়ের। বললে—'লাও! খুব হয়েছে। আর রামায়ণ পড়ে কাজ নাই।'

কৌশল্যা রামায়ণ তুলে রাখলো। হারু সিং কৌটো খুলে আর এক গুলি আফিং মুখে পুরে মাদুরের ওপরেই শুয়ে পড়লো।

বালিশটা মাথায় গুঁজে দিয়ে, বাত্তি নিভিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো কৌশল্যা। ঘরে নয়, একেবারে গেটের বাইরে এসে দাঁড়ালো। পাশে তার পিয়ারীলাল।

—বাজ সাহেব! কৌশল্যা পিয়ারীলাল বার্জকে বাজ সাহেব বলেই ডাকে।

—বলো কুশল্‌লা? পিয়ারীলাল সাগ্রহে উত্তর দেয়।

—তুমার উপর রাগ করি নাই, সাহেব।

—ইয়েস্‌। তুমারি বাস্তে কাপ্‌ড়া মোলা হ্যায় কুশল্‌। দেখো—।

কৌশল্যা কেন জানি হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠে।

—হাস্‌তি হ্যায়?

—তোমার বাক্যিতে নয়, সাহেব। আমার ভাগ্যির কথা ভেবে। তুমি যে খেষ্টান; রামায়ণ তো পড় নাই!

—কিয়া হ্যায় উসমে?

—কিয়া হ্যায়! আমি, তুমি—আমরা। কৌশল্যা মধুর গ্রীবাভঙ্গী করে পিয়ারীলালের বুকের দিকে মাথাটা বেঁকিয়ে দিলো। গলায় তার তরল হাসি আর উত্তাপ, 'সবাই আছি, বাজ সাহেব। আমরা সবাই। তুমি ইন্দ্র; নয় কি?' কথার শেষে কৌশল্যা আবার খিলখিল করে হেসে উঠলো, 'আমি অহল্যা।'

পিয়ারীলালের হাত থেকে শাড়ি আর পাউডার নিয়ে কৌশল্যা বললে, 'আর ক'দিন পরেই তো পূজা, জান তো বাজ সাহেব?'

—জরুর। থিয়েটার হোগা ক্লাবমে। হাম্‌ভি পার্ট করছি কুশল্‌। ইউ সি, কার্ভালো কা পার্ট। ডাকু, পাইরেট।

—তুমি ডাকাতই বটে, সাহেব।

কৌশল্যা আর দেরি করে না। পিয়ারীলালের জামাটায় আস্তে একটু গা-ছোঁয়া দিয়ে মিলিয়ে যায়।

আশ্বিন শেষ হলো। এলো কার্তিক। প্রথম সপ্তাহেই পূজো। কোলিয়ারীর কাঁচা পয়সা। টাকার অভাব হয় না কোনো কালেই।

হাসপাতালের সামনে ধুমধাম করে প্রতিমা বসান হয়েছে প্রতিবারের মত। বিরাট পূজোপ্যাণ্ডেল। তার পাশে মেলা বসেছে। হরেকরকম দোকান আর বাতি। পিয়ারীলালের নিশ্বাস ফেলবার সময় ছিলো না এ ক'দিন। প্যাণ্ডেল সাজাতে, বাঁশ বেঁধে ষ্টেজ করতে, ইলেকট্রিক তার টেনে টেনে আলো ঝোলাতে আর পাঁচজনের মতন পিয়ারীলালও গলদঘর্ম হয়ে উঠলো। একাই দশজনের হয়ে গতর দিয়ে খাটলো ও।

সপ্তমী পূজোর সন্ধেয় প্রসাদ রুমালে বেঁধে পিয়ারীলাল এক ফাঁকে পালিয়ে এলো কৌশল্যার কাছে। ক'দিন ধরে কৌশল্যার জ্বর।

পিয়ারীলাল যখন এলো সুপারিন্‌টেনডেণ্ট্‌ সাহেবের সারা বাংলোটা তখন নিস্তব্ধ, চুপচাপ। সবাই গেছে ঠাকুর দেখতে।

আজ আর ভয় নেই। জানালায় এসে ডাকতে কৌশল্যা বিছানা ছেড়ে উঠে জানালা খুলে দিলে। জানালা টপকে ঘরে ঢুকলো পিয়ারীলাল।

ক'দিনেই মুখ চোখ শুকিয়ে গেছে কৌশল্যার।

—তবিয়ৎ কেমন্ হ্যায়, কুশল্লা—? পিয়ারীলাল কৌশল্যার মুখের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো। কৌশল্যার সঙ্গে কথা বলতে পিয়ারীলাল আজকাল বাংলার আশ্রয় নেবার চেষ্টা করে।

—ভালোই। কৌশল্যা বিছানার ওপর বসতে বসতে বললো, 'তুমি বুঝি পূজা থেকে আসছো, সাহেব?'

মাথা নাড়লো পিয়ারীলাল। পকেট থেকে রুমালে বাঁধা প্রসাদ বের করে এগিয়ে দিলো কৌশল্যার দিকে।

-কি ?

—প্রসাদী। ফর্ ইউ। ব্লেসেড্ চিজ্। খা লোও। বোখার ঠিক হো যাগা।

কৌশল্যা পিয়ারীলালের প্রসাদ-ধরা হাতের দিকে তাকিয়ে পাথরের মত বসে থাকলো।

হঠাৎ খেয়াল হলো পিয়ারীলালের কৌশল্যার চোখের কোল দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

অবাক মানলো পিয়ারীলাল। হক্‌চকিয়ে গেছে ও। কি করবে বুঝতে না পেরে হাতের প্রসাদটা কৌশল্যার কাছে নামিয়ে রাখলো। অস্বস্তিকর ভঙ্গীতে এদিক ওদিক তাকাতে

তাকাতে শেষ পর্যন্ত কৌশল্যার পায়ের কাছে বসে পড়ে বললে 'রোতি হ্যায় ক্যায় ? ডোণ্ট উইপ্।'

চোখের জল মুছলো কৌশল্যা। পিয়ারীলালের দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে ধরা গলায় বললে, 'সাধ করে কাঁদি নাই ; তোমার কাণ্ড দেখে কাঁদি, বাজসাহেব।'

কৌশল্যার হাসি-কান্নায় মেশা মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে পিয়ারীলাল।

কৌশল্যা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কি বোঝে কে জানে, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। মাটি থেকে তুলে নেয় প্রসাদের ছোট্ট পুঁটলিটা।

—তুমি বড় বোকা, সাহেব !

পিয়ারীলালের ঘোর ভাঙে। উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'কাহে ?'

প্রসাদের পুঁটলিটা দেখিয়ে কৌশল্যা বলে, 'এ সোহাগ ছাড়তে বুকটা কন্‌কনায়। কিন্তু—'

আশ্চর্যভাবে হাসে কৌশল্যা। চোখের কোল ওর ভিজে এসেছে আবার। অনেক কষ্টে সামলে নেয় নিজেকে ; বলে, 'তুমার হাতের প্রসাদ খেলে আমার জাত যাবে, সাহেব। জাত লিতে চাও ? লাও। তুমি যে ইন্দ্র, বাজসাহেব। ডাকাত। অহল্যার সব লিবে। লাও।'

কৌশল্যা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে।

হক্‌চকিয়ে যায় পিয়ারীলাল। কি করবে স্থির করতে না পেরে পিয়ারীলাল হঠাৎ কৌশল্যার হাত ধরে কাছে টেনে নেয়। পিয়ারীলালের বুকে মাথা রেখে কৌশল্যা বলে,—

আজ তুমি যাও, সাহেব। শরীলটা ভালো নাই। কাল এসো—'

—কা-ল ?

—হাঁ! তুমার নাটুকে সাজটা পরে এসো! পার্ট তো দেখতে পারবো না—সাজটাই না হয় দেখিয়ো। কেমন ?

—সার্টেন্‌লি নট্‌। মাগর তুমি রও মাত, কুশল। হাম্‌কো—

পিয়ারীলালের মুখে হাত চাপা দেয় কৌশল্যা ; জড়িত কণ্ঠে বলে—'কাল। আজ আর লয়।'

পিয়ারীলাল জানালা টপকে বাইরে এলো। ফ্যাকাশে আলো পড়ে তিন নম্বর পিট্‌টা দূর থেকে কেমন যেনো দেখাচ্ছে। পকেট থেকে মাউথ-অর্গান বের করে মুখে ঠেকালো পিয়ারীলাল।

থিয়েটার শেষ হতে তখনো অনেক দেরি।

পঞ্চু সাহানা হঠাৎ পিয়ারীলালকে আড়ালে ডেকে আনলো। পঞ্চু সাহানার চোখ দুটো বড় হয়ে উঠেছে। নিশ্বাস নিচ্ছে দ্রুত।

—পার্ট তো তুমি খাসা ক'রছো, পিয়ারী। বইয়ের শেষ পর্যন্ত তোমার পার্টও রয়েছে। কিন্তু এদিকে যে বিপদ।

—কিয়া হুয়া হ্যায় ? আই ক্যান্‌ কিল্‌ মানসিং—মাই কিং। গিভ্‌ মি অর্ডার। পিয়ারীলালের মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে ভর ভর করে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি পারো। কিন্তু এদিকে যে সাংঘাতিক বিপদ পিয়ারী! পঞ্চু সাহানা ওকে আরো একটু আড়ালে টেনে আনলো। পকেট থেকে মদের বোতল বের করে দিলে।

—নাও, আর একটু টেনে নাও।

অনুরোধের প্রয়োজন ছিল না। পিয়ারীলাল বোতলটা নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে এক নিশ্বাসে যতোটা পারে গলায় ঢেলে নিলো।

পঞ্চু সাহানা পিয়ারীলালকে দেখছিলো। কার্ভালোর সাজে, পেণ্ট্ মুখে মেখে পিয়ারীলালকে বাস্তবিক সুন্দর দেখাচ্ছে। আর আশ্চর্য, লোকটা পার্ট ক'রছে চুটিয়ে।

মুখ মুছে পিয়ারীলাল বললে—'লেট ম্যাত করো, পঞ্চু। জল্দি বোলো।'

পঞ্চু দেখলো আর মুখ বন্ধ করে রাখা চলে না। প্রায় এক নিশ্বাসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে ও, 'তোমার কৌশল্যা বিবি তোমায় ডাকছে।'

—কুশল্? ইয়েস্। উ আয়ি হ্যায়? কঁাহা হয় কুশল্?

—হাসপাতালে।

পিয়ারীলাল পঞ্চুর দিকে সোজা চোখে তাকায়।

—হাসপাতালেই এসেছে, পিয়ারী। ওর পেটে বাচ্চা ছিলো। কেমন করে না জানি পড়ে গিয়ে সাংঘাতিক কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেছে। রক্তারক্তি ব্যাপার। বাঁচাব না বোধ হয়। গাড়িতে করে একটু আগে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে, হারু সিং।

—খুন? পিয়ারীলালের সমস্ত মুখে উদ্বেগ আর আশংকা।

—তোমার নাম করে ডাকছে। একবার যাও।

পিয়ারীলাল চলে যাচ্ছিলো. হঠাৎ পঙ্কু সাহানা ওর কাঁধে হাত রেখে বললো, 'কৌশল্যার পেটের ছেলেটা কার? তোমার নাকি, সাহেব?'

পিয়ারীলাল মাথা নাড়লো। না।

—খুব সাবধান, পিয়ারী। হারু সিং পুলিশ আনিয়েছে। যা-তা একটা কিছু করে বোসো না।

হাসপাতালে এসে পিয়ারীলাল দেখে লেবাররুম থেকে খানিক আগে কৌশল্যাকে এনে আলাদা ঘরে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে।

বারান্দায় কয়েকজনের ভিড় রয়েছে তখনো। ডাক্তারবাবু, হারু সিং, পুলিশ ইনস্পেক্টার, সেনগুপ্ত সাহেব।

পিয়ারীলাল কাছে আসতে ডাক্তারবাবু ওকে কাছে ডাকলেন, 'ইউ লাইক্ টু মিট্ হার?'

—ইয়েস, স্যার। পিয়ারীলাল স্যালুট ঠুকে কার্ডালোর কায়দায় দাঁড়ালো। কোমরের পাশে বাঁধা তলোয়ারটা ঝুলছে।

—ইউ ক্যান্ গো। বাট্ ডোণ্ট ডিষ্টার্ব।

পিয়ারীলালের পা টলছিলো। ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো ও। বিছানার মধ্যে চোখ বন্ধ করে পড়ে রয়েছে

কৌশল্যা। আস্তে আস্তে কৌশল্যার পাশে এসে পিয়ারীলাল ডাকে, 'কুশল্—'

কৌশল্যা যেনো চোখ বন্ধ করে অপেক্ষা করছিলো এই ডাকটুকু শোনবার আশায়। ওর কানে পিয়ারীলালের দেওয়া সেই ক্যারেটগোল্ডের ইয়ারিং দুটো ঝুলছে। চোখ মেলে তাকালো কৌশল্যা।

ঘরের ফিকে সবুজ আলোয় কার্ভালোর সাজপরা পিয়ারীলালের দিকে তাকিয়ে কৌশল্যার নিস্তেজ চোখের পাতা দুটো খোলাই থাকলো। খানিক পরে ক্ষীণস্বরে কৌশল্যা ডাকলো, 'বাজসাহেব—'

পিয়ারীলাল কৌশল্যার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে। —মাই কুইন্, গিভ্ মি অর্ডার।

কৌশল্যার চোখের জলে গাল ভেসে যাচ্ছে। পিয়ারী-লালের হাতটা টেনে নিয়ে কৌশল্যা বললে, 'তুমায় কি সুন্দর দেখাচ্ছে বাজসাহেব। তুমি বুঝি রাজার পার্ট করছো?'

—নো। কম্যাণ্ডার। কুশল্—তুমার ল্যাড়কা কাঁহা?

অতো কষ্টেও কৌশল্যার হাসি পেলো। চোখের জলে সে হাসি মুছে বললে—'আছে।'

—ডোণ্ট্ উইপ্। পিয়ারীলাল কৌশল্যার মাথায় হাত রাখলো। বলার আর কিছু ছিলো না তার।

বাইরে আসতে হারু সিংয়ের চ্যালা কেষ্ট মাইতি পিয়ারী-লালের হাত চেপে ধরলো—শালা দোআঁশলার জাত!

ডাক্তারবাবুর ঘর থেকে একবার ঘুরে এসো তারপর দেখাচ্ছি তোমায়। জান্ নিয়ে নেবো আজ।

পিয়ারীলাল এক ধাক্কায় কেষ্ট মাইতিকে ছিটকে ফেলে দিয়ে গট্‌মট্ করে ডাক্তারবাবুর ঘরে ঢুকলো।

ডাক্তারবাবুর ঘরে ঢুকে স্যালুট ঠুকে দাঁড়ায় পিয়ারীলাল। কি কথা হচ্ছিলো কে জানে। সবাই চুপ করে যায়।

পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টার ঘরের কোণে রাখা কাগজে মোড়া ভিজে একটা লাল শাড়ির দিকে ইঙ্গিত করেন—এহি কাপড়া কোন্‌কা ?

—কুশল্‌কা।

—তোমকো মালুম হ্যায় ?

—ইয়েস। আই গেভ্ হার।

—তুম্ ওই জানানাকো ঘরমে যাতা থা ?

—ইয়েস।

—ক্যাহে ?

—আই লাভ হার। পিয়ার করতা হ্যায় উসকো।

—সোয়াইন। পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টার দাঁতে দাঁত চেপে গর্জন করেন।

—কৌশল্যা তোমার কে, পিয়ারীলাল ? সেনগুপ্ত সাহেব প্রশ্ন করলেন।

—সি ইজ্ মাই—কথার মাঝ পথে হঠাৎ থেমে গেলো পিয়ারীলাল।

ডাক্তারবাবু এবার বললেন, 'সি ওয়াজ্ প্রেগন্যান্ট—লড়্কা হোনে বালি থি—ইউ নো দ্যাট্, বার্জ?

—ইয়েস্।

—তুমি জানো পিয়ারীলাল, কৌশল্যা হিন্দু। হারু সিং ওকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসে নিজের কাছে রেখেছিলো। সি ইজ উইডো। হারু সিং ওর ধর্ম-বাবা।

—নো। নেহি জানতা হ্যায়। পিয়ারীলাল এবার চটে উঠেছে।

—ইউ টেল্ মি বার্জ, হুজ্ চাইল্ড্ ইজ্ দ্যাট্—? ডাক্তার-বাবু বললেন, 'কৌশল্যার পেটের ছেলেটা কার?'

এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলো বার্জ—পিয়ারীলাল বার্জ। তারপর বললে, 'মাই সান। হ্যামকো বেবি।'

পরের দিন সকালে তিন নম্বর পিটের সামনে পড়ে থাকতে দেখা গেলো পিয়ারীলালকে। মাথা ফাটা, মুখে চোখে রক্ত জমে একাকার হয়ে রয়েছে। নিজের জায়গাটিতে টিনের শেডের তলায় পিয়ারীলাল মুখ থুবড়ে পড়েছিলো। ওর গায়ের কার্ভালোর সাজ ছেঁড়া। তলোয়ারটা পড়ে রয়েছে দূরে।

পঞ্চু সাহানা সকাল বেলায় খোঁজ করতে এসে ওকে দেখলো। জল এনে মুখের রক্ত পরিস্কার করতে বসলো; কোলের ওপর টেনে নিলো পিয়ারীলালের মাথা।

চোখ খুলে চাইলো পিয়ারীলাল। সকালের আলোয় প্রথমেই চোখে পড়লো পঞ্চুর মুখ।

পঞ্চু বললে, 'তোকে বুঝি কাল একা পেয়ে মেরেছে, পিয়ারী ?'

পিয়ারী মাথা নাড়লো।

দাঁতে দাঁত চেপে বললে পঞ্চু, 'আচ্ছা ; শালা হারু সিংকে আমিও দেখে নেবো।' কথাটা বলেই হঠাৎ পঞ্চুর মনে পড়লো হারু সিং কাল রাত্রেই পালিয়েছে।

পঞ্চু সাহানা আবার বললে, গলায় তার বিদ্রূপ, 'জানিস পিয়ারী, হারু সিং পালিয়েছে ?

পয়ারীলাল অবাক হয় না। শুধু বলে, 'ভাগা হ্যায় ?'

পঞ্চু জোরে মাথা নাড়ে। বলে, 'ভাগবে না তো কি ? শালা বুড়ো এতোদিন খুব ধম্মবাবা সেজে মজা লুঠছিলো। এবার চম্পট্। কৌশল্যা সব ফাঁস করে দিয়েছে।'

পঞ্চু হারু সিংয়ের উদ্দেশ্যে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেয়। পিয়ারীলাল বলে, 'ড্যাম্ ইট্। পঞ্চু, কুশল্—?'

—হাসপাতালে ; ভালো আছে। বাচ্চাটাও।

পঞ্চুর কাঁধ ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে চলে পিয়ারীলাল তিন নম্বর পিটের সামনে দিয়ে। চলতে চলতে একজায়গায় থমকে দাঁড়ায় পঞ্চু। মাটি থেকে পিয়ারীলালের মাউথ অর্গানটা কুড়িয়ে নেয়। ওর হাতে দিয়ে বলে, 'তোর বাঁশি।'

পকেটে রেখে দেয় পিয়ারী। আরো কয়েক পা এগিয়ে পিয়ারীলাল বললে, 'পঞ্চু, হাম্ হিঁয়া পর নেহি রহেগা।'

—আমিও তাই বলি। এখানে তোর অন্ন জুটবে কিন্তু ইজ্জত আর জুটবে না।

—ঠিক বাত হ্যায়, পঞ্চু। হাম্‌কা ইজ্জাত ছোড়ো ; বাট্‌ কুশল্‌ ?

—কি করবি কৌশল্যাকে নিয়ে ?

—হামকা সাথ লে যাগা।

নীরবে পিয়ারীলাল পঞ্চুর গলা জড়িয়ে খানিকটা পথ হেঁটে এসে হঠাৎ হেসে ওঠে। পঞ্চু সাহানা অবাক হয়।

—হাসছিস্‌ কেনো ?

—পঞ্চু, হাম্‌ এক্‌লা মধুবনমে আয়া থা। নাউ উই আর থ্রি—তিন আদমী। হাম—হামকো কুশল্‌, আউর হামকা ল্যাড়্‌কা ! পিয়ারীলাল আশ্চর্য সুন্দর হয়ে হাসে।

পঞ্চু বুঝি অসতর্ক মুহূর্তে একটু চমকে উঠলো, 'তোর ল্যাড়কা ? ও. হ্যাঁ তোরই তো। তোদেরই তো।'

ইঁদুর

অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে যতীন।

আর একটু হলেই ডান হাতের আঙুল কটা ওর ইঁদুর-মারা কলে থেঁতলে যেতো। র‍্যাশন-আনা ক্যাম্বিসের থলেটা বার করতে হাত বাড়িয়েছিলো বেঞ্চির তলায়। কে জানতো, ওরই তলায় ওৎ পেতে বসে আছে সর্বনেশে কলটা। লোহার ধারালো দাঁত আঙুলে ফুটতেই চট্ করে হাত সরিয়ে নিয়েছে, তাই না রক্ষে।

সাবধানে কলটাকে বাইরে টেনে আনে যতীন। তীক্ষ্ণদন্ত ইস্পাতের যন্ত্রটা হাঁ করে রয়েছে; সন্ত-ধার-দেওয়া অর্ধচন্দ্রাকার দুটি করাতের ফলা শিকার ধরার সম্ভাবনায় তখনও অপেক্ষমান।

—কই. শুনছো, শীগ্রি একবার এসো তো এখানে! রুক্ষগলায় হাঁক পাড়ে যতীন।

. সামনে দালানে বসে বাসি রুটিগুলো দালদায় ভেজে নিচ্ছে মলিনা। বসে বসেই উত্তর দেয়, 'আমার হাত জোড়া। কি বলছো বলো?'

. —এখান থেকে বললেই যদি হবে, তবে তোমায় সোহাগ করে ডাকছি কেন? ঘরে এসে স্বচক্ষে তোমার কাণ্ডটা একবার দেখে যাও।

যতীনের তাগিদ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না মলিনা। পরিপাটি করে স্বামীর জলখাবারের থালা গুছোয়। দালদায় লালচে করে ভাজা খান চারেক বাসি রুটি, দু টুকরো বেগুন ভাজা, একটু গুড়।

স্বামীর দিকে জলখাবারের থালাটা এগিয়ে দিয়ে মলিনা বলে, 'অমন করে হাঁক পাড়ছো কেন, হয়েছে কি ?

—হয়নি ; তবে আর একটু হলেই মোক্ষম একটা কিছু হতো—! মুখ চোখের এক বিচিত্র ভঙ্গী করে যতীন কলটার প্রতি ইঙ্গিত করে।

মেঝের দিকে তাকিয়ে মলিনা একটু অবাকই হলো হয়তো।

—ওটা আবার টেনে বের করতে গেলে কেন ?

—না, বার করবো কেন, ভেতরে ঢুকিয়ে রেখে দি ; তারপর আমার আঙুল কটা উড়ে যাক, না হয় তোমার পায়ের গোড়ালি—? রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে যতীন কুঁচকোয়।

—আহা, কি আমার বাক্যি রে—ঃ মলিনা স্বামীর প্রতি ভ্রূভঙ্গি হেনে মেঝেতে উবু হয়ে বসতে বসতে বলে, 'ধান ভানবো মরণ কালে, দাঁড়িয়ে থাকি ঢেঁকিশালে। কবে তোমার হাত কাটবে, পা কাটবে, তাই ভেবে কলটাকে সিন্দুকের মধ্যে পুরে রাখি !'

আহার-পর্ব শুরু হয়েছে। তবু চটেমটেই উত্তর দেয়, যতীন, 'মেয়েলি শ্লোক কেটো না। আর একটু হলেই তো

আমার আঙুল কটা সাবাড় হয়ে গিয়েছিলো, মরণকাল পর্যন্ত তোমায় আর ঢেঁকিশালে অপেক্ষা করতে হতো না!'

ইঁদুরকলে হাত দিয়েছিলো মলিনা; স্বামীর কথাটা কানে যেতেই হাত সরিয়ে নিলো। তাকালো যতীনের মুখের দিকে।

—বেঞ্চির তলায় হাত ঢুকিয়েছিলে কেন?

—থলে বের করতে।

—একটু আর তর সইছিলো না, যতো রাজ্যির জিনিসপত্র হাঠকাতে লাগলে! উষ্ণস্বরে বলে মলিনা; ইঁদুরকলটা ঠেলে এক পাশে সরিয়ে রাখে।

বেঁকা চোখে যতীন স্ত্রীর ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করছিলো। কলটা সম্পর্কে এতটা তাচ্ছিল্য তার মনঃপূত নয়।

—আবার, আবার সেই—কথাটা গ্রাহ্যি হলো না?

—না, হলো না। মলিনা উঠে দাঁড়ায়। কথা দিয়েই ও যেন ধমকে দেয় যতীনকে, 'অযথা তুমি সর্দারি করো না তো! আমার সংসার, আমি যা ভালো বুঝবো করবো।

—কোথায় ইঁদুর তার ঠিক নেই কল পেতে বসে আছে! যতীন বিড়বিড় করে।

—কোথায় ইঁদুর তুমি তার কি জানো? আমি বুঝি, তাই কল পেতে বসে থাকি! তুমি মাথা ঘামাও কেন? পাল্টা জবাব দেয় মলিনা। কথার শেষে ঘর ছেড়ে চলে যায়। স্ত্রীর অহেতুক একগুঁয়েমিতে বিরক্ত হয়ে ওঠে যতীন।

চায়ের কাপ হাতে করে একটু পরেই মলিনা আবার ঘরে ঢোকে।

—টাকা নেবে না ? স্বামীকে লক্ষ্য করতে থাকে মলিনা।

—নোবো না তো টাকা পাবো কোথায় ? মুফতিতে র‍্যাশন দেবে, অফিসটা আমার শ্বশুর বাড়ি কি না। এঁটো থালাটা মেঝেতে রাখতে রাখতে মেজাজী গলায় বললে যতীন। চায়ের কাপটাও উঠিয়ে নিলে।

—আবার সেই কথা ? কতোদিন না বলেছি আমার বাপ-মা নিয়ে যা মুখে আসে বলবে না! চট করে চটে ওঠে মলিনা।

—বয়েই গেছে আমার তোমার বাপ-মা নিয়ে কথা বলতে !

—ও! শুনি তবে শ্বশুরটা তোমার কে ?

মলিনার কথার কোনো জবাবই দেয় না যতীন। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব চায়ের কাপটা নিঃশেষ করে বেরিয়ে পড়তে পারলেই ও যেন বাঁচে।

মলিনা নিরুত্তরে র‍্যাশনের থলে গুছোয় ; বাক্স খুলে টাকা বের করে তক্তাপোশের ওপর রাখে।

চা খাওয়া শেষ হয়েছে যতীনের। পায়ের মোজাটা ঠিকঠাক করে হাঁটুর নীচে দড়ি বাঁধে। তাক থেকে পেন্সিল আর নোট খাতাটা উঠিয়ে নিয়ে বুক-পকেটে গোঁজে। তারপর একটা বিড়ি ধরায়।

—আর টাকা ? পাঁচ টাকার নোটটা হাতে করে যতীন স্ত্রীর মুখের দিকে তাকায়।

—টাকার গাছ আছে নাকি আমার—যা ছিল দিলুম। দুটো টাকা আর বাজারের আছে। ভালো কথা, বাজার করে দিয়ে যেও ! মলিনার গলায় বেশ ঝাঁঝ।

একটু বুঝি হতভম্ব হয়ে পড়ে যতীন; চট করে জবাব খুঁজে পায় না। সামলে নিয়ে বলে, 'পনেরো দিনের র‍্যাশন পাঁচ টাকায় হয়, নাকি? ফি বার তো দিচ্ছো।'

—এবার নেই তো দেবো কোত্থেকে? চুরি বাটপাড়ি করবো? ফিরতি প্রশ্ন মলিনার।

এক মুহূর্ত স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে যতীন বলে, 'বেশ। পাঁচ টাকায় যা হয় নিয়ে আসবো।' কথার শেষে নোটটা খাকি হাফ-প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে নেয়।

যতীন বেরিয়ে যাচ্ছিলো মলিনা বললে আবার, 'বাজার করে দিয়ে যাও।'

—সময় নেই! অটটায় ডিউটি, সাড়ে সাতটা বেজে গেছে।

—ভালোই তো, আমার আর কি, ডালভাত রেঁধে রেখে দেবো। আমার মুখে সব রোচে।

—আমার-ও! যতীনের জবাব।

—কিন্তু তোমার বন্ধুটির? তাঁর তো আজ সকালেই ফিরে আসার কথা। সন্ন্যাসী মানুষ, তায় আবার প্রাণের ইয়ার পঞ্চাতেলি। ফল চাই, মূলো চাই, কলা চাই! কোনো ত্রুটিটুকু হবার যো নেই। হলে তোমার মাথা কাটা যায়; আর আমার বাপ ঠাকুরদাকে সগ্‌গো থেকে টেনে এনে হেলাফেলা করা হয়—। তাকের ওপর অযথা ঘুঁটিনাটি কি একটা গুছোতে গুছোতে ভারি গলায় বললে মলিনা।

—বাসু আজই কল্যাণেশ্বরী থেকে ফিরছে নাকি? যতীন ঘুরে দাঁড়ায়।

—কি জানি, বলে তো গেছে—

—হুঁ। যতীন মাথা নাড়তে নাড়তে টানা একটা শব্দ করে মুখ বুজেই। তারপর মুখ খোলে, 'আমার আর সময় নেই। যা হয় ক'রো।'

দালানে নেমে যতীন তার ঝড়ঝড়ে সাইকেলটার চাকা পরখ করছে, দেখছে পাম্প আছে কি না—শুনলো ঘর থেকে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে মলিনা বলছে, 'করবো আবার কি? আমি কিচ্ছু করবো না রোজ রোজ পরকে পায়ে ধরে সেধে বাজার আনানো। আমি আর কাউকে সাধাসাধি করতে পারবো না—যা আছে ঘরে তাই ফুটিয়ে রেখে দেবো। এতে কার পেট ভরলো না, মন উঠলো না, অতো আমার দেখার দরকার নেই।

যতীন চলে গেলো। খোলা দরজা দিয়ে দেখলো মলিনা—সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে হাত রেখে সেই একই ভাবে স্বামী তার প্রস্থান করলে। ওর চলে যাওয়ার ভঙ্গীটাই এমন যা থেকে মনে করা যায় সকালবেলার দাম্পত্যকলহের জের সবটুকুই স্ত্রীর কাছে জিম্মা দিয়ে ও নিজে খালাস পেলো; চলে গেলো।

মলিনা দু'চার মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো—শুধুশুধুই। তারপর ঘরের চারপাশটা লক্ষ্য করলে একবার। পরক্ষণেই তাকে দেখা গেল এঁটো বাসন আর কাপ দুটো নিয়ে দালানে রেখে এসেছে। আবার একবার বিছানা ঝাড়লো; ঘর ঝাঁট দিলো। জলের ন্যাতা দিয়ে মুছতে লাগলো ঘরের মেঝে।

বসে বসে উবু হয়েই ঘর মুছছিলো মলিনা। বেঞ্চির কাছে আসতেই ইঁদুরমারা কলটা আবার তার চোখে পড়ে। ঠিক আগের মতই মুখব্যাদান করে বসে আছে যন্ত্রটা। হাতের কাজ থামিয়ে মলিনা একমনে তাই দেখে।

এই নিয়েই তো যতো গণ্ডগোল, মলিনা ভাবছিলো : অফিস যাবার আগে অযথা কথা কাটাকাটি। যতীন হয়তো রাগ মনেই পুষে রাখলো। অফিসে একটা কেলেঙ্কারীও বাঁধাতে পারে—চাই-কি দুপুরে হয়তো খেতেই আসবে না বাড়িতে। এমন ঘটনা মাঝে মাঝে হয়েছে বইকি। বাড়িতে কিছু বলে নি যতীন, ওর মুখ দেখে বোঝবারও উপায় ছিলো না, রাগের আঁচে তেতে আছে তার মন। মলিনা বসে আছে তো বসেই আছে—দুপুর গেলো, বিকেল গেলো—সেই সন্ধের গোড়ায় সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে ফিরলো যতীন। শুকনো মুখ, রুক্ষ চুল, চোখ বসে গেছে। কোথায় ছিলে, কেন দুপুরে খেতে আসো নি, কি খেয়েছো ? জানো, তোমার জন্যে আজ একটু ইলিস মাছ আনিয়ে ঝাল রেঁধেছি, বড়ি ভেজেছি, টক করেছি লাউয়ের। আর হ্যাঁ মশাই, আমিও দাঁতে কাটি দিয়ে পড়ে আছি সারাদিন। থাক থাক, সোহাগ দেখাতে হবে না। কতোই তো বউয়ের ওপর টান। তাই তো—! মলিনা অভিমানে কেঁদে ফেলেছে। তখন যতীন ওর কান্না থামিয়েছে—চোখের জল দিয়েছে মুছে। বলেছে, আর কখনোও এমন গর্হিত কর্ম করবো না, লক্ষীটি ; সত্যি বলছি, মাইরি, তোমার দিব্যি।...আবার ওরা জোড় বেঁধে থালা

সাজিয়ে খেতে বসেছে, গল্প করেছে হিজিবিজি, হাসিতে হাসিতে ছোট্ট ঘরখানাও যেন হেসে উঠেছে।

আনন্দে, খুসিতে, পরিচ্ছন্নতায়, নিবিড় সাহচর্যে এই ছোট্ট ঘরখানা হেসে উঠুক, খুসিতে টইটুম্বুর হয়ে থাক ওরা দুজন, দুটি মন; মলিনা তো তাই চেয়েছে। তাইতো এতো। কিন্তু এটা বাড়ি নয়, বস্তি। তবু বাড়িই বলো। এমন বাড়িতেই তো তাদের মত গৃহস্থরা থাকে এখন। খোলার চালের ঘর একখানা আর একফালি দালান। সামনে একটু মাটির উঠোন। ভাড়া কুড়ি টাকা। তাও অনেক ধরা-কওয়া করে;. নয়তো এই বাড়িরই নাকি ভাড়া ছিলো চব্বিশ।

অফুরন্ত উৎসাহ নিয়ে মলিনা এ বাড়িতে পা দিয়েছিলো। কিন্তু প্রথম দিনই ঘরে ঢুকে সমস্ত উৎসাহ যেন হঠাৎ উবে গেলো। কেমন যেন ফ্যাকাসে, ভয় পাওয়া মুখে প্রশ্ন করলে, 'কু-ড়ি টাকায় এই বাড়ি?'

বিছানা খুলছিলো যতীন। লণ্ঠনের আলোয় মলিনার মুখভাব তেমন ভালো করে দেখতে পেলো না।

—কুড়ি টাকা একরকম তো সস্তাই। সে আসানসোল আর আছে নাকি! যুদ্ধের হিড়িকে আসানসোলের জমিগুলো সোনা হয়ে গেলো। আর বাড়ি—তা যেমনই হোক, মানুষকে বাঁচতে হলে চালচুলো তো রাখতেই হবে। খড়ের ছাউনি, খোলার চাল, টিনের চালা—চোখের পলকে এক-একটা রাজত্বি বনে গেল। এই শালার ঘর তিন বছর আগে তিন টাকাতেও

ভাড়া হতো না। আর এখন—। বিছানা খোলা শেষ করে যতীন হাঁফ ছাড়লো।

লণ্ঠন নিয়ে মলিনা তখন ঘরের ইতি-উতি দেখছে। ইস্, মাগো ঘরের মেঝের কি ছিরি। সিমেণ্টের একটা পাতলা প্রলেপ না থাকলে সেঁতসেঁতে মাটির ওপরই তারা দাঁড়িয়ে থাকতো। সিমেণ্টেও কি আছে না কি—ফেটে ফুটে একাকার ! ঘরের এখানে ওখানে বড় বড় গর্ত—দেওয়ালে চিড় ধরেছে : আর মাথা ; কোন্ যুগের ছেঁড়া চট্ দিয়ে সিলিং করা, এখনও তাই টিঁকে আছে। তবু রক্ষে যেমন-তেমন করেও ঘরে সন্থ একবার কলি ফিরিয়ে দিয়ে গেছে বাড়িওয়ালা। এখনও চুনের গন্ধ ভাসছে। নয়তো দুর্গন্ধেই প্রাণ যেতো।

—ও, মাগো—হঠাৎ বিশ্রী রকম ককিয়ে উঠলো মলিনা। ধড়মড় করে চৌকির ওপর লাফিয়ে উঠতে গেলো। লণ্ঠনটা চৌকিতে ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়লো মেঝেতে। দপ্ দপ্ করে লণ্ঠনের কাঁপা, অসম, এলানো শিষটা কাঁচের মধ্যে কিলবিল করলো, জমলো খানিকটা ধোঁয়া, আর তারপরই সব অন্ধকার। নিকষ কালো রঙে সবকিছু ডুবে গেলো, মুছে গেলো।

—কি হলো ? এ্যাঁ—? যতীন উদ্বেগভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করলে।

—ইঁদুর ! মলিনার গলার স্বর দ্রুত, হ্রস্ব, আতঙ্কভরা।

—ইঁদুর ! যতীন প্রথমে বোবা, তারপর তাচ্ছিল্যমাখা তরল সুরে প্রত্যুত্তর দিয়ে অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ে, 'বাব্বা ! যেমন করলে তুমি আমি চমকে উঠেছিলুম। ভাবলাম না জানি সাপ খোপ হবে।'

লণ্ঠন জ্বালালো যতীন। মলিনাকে দেখলো। ওর মুখচোখে তখনও ভয় লেপ্টে রয়েছে।

—আরে, অমন মুখ করে বসে আছো কেন? মনে হচ্ছে যেন—

যতীনের কথায় বাধা দিয়ে মলিনা বললে, 'কই, দেখি, তোমার হাত দেখি। দেখো আমার বুকটা এখনও ধক্‌ধক্‌ করছে।' যতীন হাত দিয়ে অনুভব করলো; সত্যিই মলিনার হৃদপিণ্ড দ্রুততালে বেজে চলেছে।

—আশ্চর্য, এতো ভয় তোমার ইঁদুরে!

—তা বাপু, ভয়ই বলো আর ঘেন্নাই বলো, ওই বিদিকিচ্ছি জন্তুগুলো দেখলে আমার গা গুলিয়ে আসে। আস্তে আস্তে জবাব দিলো মলিনা বিকৃত মুখভঙ্গী করে, স্বামীর চোখে চোখ রেখে। একটু থেমে বললে আবার, 'এ বাড়ির চৌকাঠে পা দিয়েই আমার জন্মশত্তুরগুলো চোখে পড়লো। তখন থেকেই গা বিড়োচ্ছে। তার ওপর পড়বি তো পড়, হতভাগা একেবারে পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো গা।'

—আজব কাণ্ড তোমার! যতীন বললে, 'ইঁদুর কোথায় না থাকে?'

—থাক্‌, সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে থাক; আমার ঘরে থাকা চলবে না। দু চোখের বিষ আমার। পাজি, নোংরা, কুচ্ছিৎ··· মলিনার ঠোঁট, চোখ, নাক, মুখ ঘৃণায় কুঁচকে কুশ্রী হয়ে উঠলো।

মুখে যা বলেছিলো মলিনা—সেইদিন সেই প্রথম এ বাড়িতে পা দিয়ে, অক্ষরে অক্ষরে তা ফলিয়ে ছেড়েছে। প্রথম দিন

থেকেই, মলিনার সে কি অসাধ্য সাধন। মেঝেতে কোথায় গর্ত, দেওয়ালে কোন্ কোণে ফাটল, দালানে জঞ্জাল জড় করা কেন—এ সবের মধ্যেই তো ইঁদুরের রাজত্ব। ইঁটের গুঁড়ো, কাঁকর, বালি, পাথরকুচি যা পায় ঠেসে ঠেসে গোঁজে, ভরাট করে গর্তের ফাঁক, তারপর মাটি দিয়ে লেপে দেয়। যতীনদের ডিপোতে শেডের কাজ হচ্ছে, অফিস-ফেরতা পথে যতীন ভোলাবাবুর কাছ থেকে সিমেণ্ট চেয়ে রুমালে বেঁধে আনে। একটা কুর্ণিও কিনে আনলো একদিন। সারা দুপুর কোমরে কাপড় জড়িয়ে মিস্ত্রিগিরি করে মলিনা।

একটু হয়তো বাড়াবাড়িই হবে এই ইঁদুর-ভীতি। তবু কে অস্বীকার করবে ইঁদুর তাড়াতে গিয়ে মলিনা ঘরের শ্রী পাল্টে দেয় নি। আসলে তাই। কুড়ি টাকার খোলার ঘর মলিনার হাতে পড়ে শ্রী পেলো। সৌখিন না হোক শোভন হলো। যতীন মনে মনে ভাগ্যবান মানলো নিজেকে। লক্ষ্মীমন্ত বউ তার; দেখতে না দেখতে সংসারের হাল ফিরিয়ে দিলে।

ঝকঝকে, তকতকে করে ঘর সাজালো মলিনা। কাঁঠাল কাঠের তক্তাপোস, একটা বেঞ্চি, দুটো জল চৌকি, কেরাসিন কাঠের তেথাকা—এমনি সব টুকিটাকি জিনিস। প্রথম কটা মাস খুবই টানাটানি চলে সংসারে। মাইনের একশোটা টাকা থেকে বাঁচিয়ে এটা ওটা কেনা কি সহজ।

যতীন একদিন ঠাট্টা করেই বলেছিলো, 'ভাগ্যিস ভগবান আমায় রাজা করে নি গো! বেঁচে গেছি—!'

কেন? জানতে চেয়েছে মলিনা অবাক হয়ে। যতীন

হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছে, 'তা হলে তো তুমি প্রাসাদ বানাতেই ব্যস্ত থাকতে। এ অধম তোমার প্রসাদ পেতো না।

যতীনের কথায় হেসে ফেলেছে মলিনা ; স্বামীর গলা জড়িয়ে ঠোঁট ছুঁইয়ে দিয়েছে কানে, আধো-আধো স্বরে বলেছে, 'আমি মুখ্যুসুখ্যু লোক, তোমার অতো কাব্যি কি বুঝি—! তুমি যদি রাজা হতে আমি কি আর রাণী হতাম!'

—রাণী হতে না—? তবে হতেটা কি! চোখ বড় বড় করে রহস্য করেছে যতীন।

—দাসী! ছোট্ট করে উত্তর দিয়েছে মলিনা।

—বলো কি, এতো থাকতে দাসী?

—হুঁ, দাসী-ই। যা ময়লা রং আমার, বাপ-মা দেখে শুনেই নাম দিয়েছে মলিনা। রাণী কি ময়লা হয়! মলিনার গলার স্বরে আশ্চর্য জড়তা এসেছে কথাগুলো বলতে গিয়ে।

যতীন এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে উঠেছে, 'বয়েই গেছে ; হোক না গায়ের রং ময়লা—মন তো আর ময়লা নয়।'

তাই, মলিনার মন ময়লা নয়। অন্তত মলিনা যেন সেই কথাটাই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে নিয়েছে বলে মনে হয়। ময়লার উপর তাই কি ওর অতো বিজাতীয় ঘৃণা? নোংরা যা কিছু, কুৎসিতদর্শন যেখানে যা আছে, এমন কি বিকৃত, বীভৎস যা ; চোখকে যা পীড়া দেয়, মনকে অসুস্থ করে, মলিনার কাছে তার এতটুকু দয়া নেই, ক্ষমা নেই।

ইঁদুরকে ঠিক এই জন্যেই বুঝি এতো ঘেন্না মলিনার। দেখতে যেমন, থাকেও তেমনি অন্ধকার নোংরা আবর্জনার

স্তূপে। একটু ভালো করবে তোমার—বয়েই গেছে, বরং ক্ষতির বহরটা একবার হিসেব করে দেখো। চাল, ডাল, তরি-তরকারি, কাপড়, বই—সর্বত্র ওর সমান গতি। আর নষ্ট করা ছাড়া অন্য কোন কাজ নেই।

তালপুকুরের ঘরে অতো যে ইঁদুরের উৎপাত, সে উৎপাতও বন্ধ করলো মলিনা। এলো ইঁদুর-মারা কল, তারপর এলো বেড়াল, শেষ পর্যন্ত ইঁদুর মারা বিষ।

মলিনার সংসার থেকে একদিন দূর হলো এই নোংরা জীবগুলো। একেবারেই। চিরকালের মতই।

তারপর? তারপর তো বেশ ছিলো মলিনা। হঠাৎ আজ ক'দিন থেকে কেমন করে যেন একটা ইঁদুর আবার এসে পড়েছে। শব্দ শুনছে মলিনা, বুঝতে পারছে। কিন্তু কই দেখতে তো পায় না—কিছুতেই ধরতে পারেও না।

কে! মলিনা চমকে উঠলো। কে যেন ডাকলো।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো মলিনা। হাতে তার ইঁদুর-কল। দরজার কাছে সরে আসতেই উঠোনে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার সঙ্গে চোখাচুখি হয়ে গেল মলিনার। মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিকবাস, দীর্ঘদেহ একটি মূর্তি। সর্বাঙ্গ ভরে রোদ আর তপ্ততা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

—ফিরলাম কল্যাণেশ্বরী থেকে। উঠোন থেকে স্বর ভেসে আসে, 'সব যে বড় চুপচাপ। যতীন কই? অফিস বেরিয়ে গেছে?'

বাসুদেব উঠোন থেকে দালানে উঠে আসে।

মলিনার হাত থেকে কলটা পড়ে যায়। একেবারে পায়ের কাছেই। শব্দ কানে যেতে ও সম্বিত ফিরে পায়। পায়ের দিকে নজর পড়তেই দেখে মাটিতে কলটা কাত হয়ে পড়ে রয়েছে—করাতের ফলার মত মুখ দুটো বন্ধ। তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে মলিনা বলে, 'আস্থন। আপনার বন্ধু তো অনেকক্ষণ হলো বেরিয়ে গেছে।

দুপুর বেলায় খেতে এলো যতীন; রোজ যেমন আসে।

ঘরে পা দিতেই বাস্থদেবের সঙ্গে দেখা। বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে যতীন যেন আকাশ থেকে পড়লো।

—করেছিস কি রে—এঁ্যা—! মাথা কামিয়ে এলি কল্যাণেশ্বরী থেকে?

নিজের মাথায় নিজেই হাত বুলিয়ে বাস্থদেব হাসলো, 'খারাপ দেখাচ্ছে!'

—না, খারাপ কেন হবে? একেবারে মঠের মহারাজের মত দিব্যি দেখাচ্ছে! ঠাট্টা করে যতীন।

—দীক্ষা নিলুম কি না—তাই!

গায়ের জামাটা আলনায় টাঙিয়ে যতীন ঘুরে দাঁড়ায়, 'দীক্ষা—!'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে বাস্থদেব। চুপ করে থাকে, হাসে মুচকি মুচকি। বন্ধুর হাসির অর্থভেদ করতে না পেরে যতীন বলে, 'দাঁড়া, মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলে নি—তারপর তোর দীক্ষা নেওয়ার কথা শুনছি!'

স্নান সেরে খেতে বসলো যতীন ; পাশে বাসুদেব। মলিনা বাসুদেবের সামনে থালা সাজিয়ে দিয়ে গেল পরিপাটি করে। তারপর স্বামীর। আর এক দফা অবাক হবার পালা যতীনের।

—ব্যাপার কি ? আমি ভাত, তুই রুটি ? যতীন বাসুদেবের পাতের দিকে দৃষ্টি রেখেই প্রশ্ন করলে।

—আমি নিরামিস আর তুই আমিস ! আমার পাতে দুধ কলা, তোর পাতে কিন্তু ভাই, কাঁচকলা। বাসুদেব উচ্চগ্রামে হাসে।

ততক্ষণে মলিনা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—খেতে খেতে বাসুদেব বলে, 'আজ পূর্ণিমা ; ভাত খাওয়া নিষেধ।'

—কার নিষেধ, তোর গুরুদেবের ? যতীন চোখ তুলে তাকায়।

—না। নিজে থেকেই খাই না। বাসুদেব আড়চোখে মলিনার দিকে তাকালো।

খেতে বসে গল্‌গল্‌ করে ঘামতে শুরু করেছে যতীন। বাসুদেবেরও মুখে ঘাড়ে ঘাম জমে উঠেছে। মলিনা চুপটি করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখে। যতীনের খোলা গায়ে ঘামের প্রাবল্য একটু বোধ হয় দৃষ্টিকটুই হবে। অথচ তারই পাশে বসে বাসুদেব। ধবধবে ফর্সা গোলগাল মুখের ছাঁদ লোকটার। কপালটাও তেমন চওড়া নয়। ভরাট গলা। ঘাম জমেছে ফোঁটা ফোঁটা, সারা মুখ ভরে। ভিজে চন্দন দিয়ে মুখে তিলক আঁকলে বুঝি এমনই দেখায়।

—তোমার পাখা নেই ? যতীন মলিনার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

কি যেন ভাবছিলো মলিনা। স্বামীর কথা কানে যায় নি। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে সে তাকিয়ে থাকে।

—কি ? নেই পাখা ? যতীন আবার জানতে চায়।

মলিনা ঘর থেকে পাখা নিয়ে আসে।

—জোরসে একটু বাতাস করো তো। খাবো কি, ঘামেই মলুম। যা ভ্যাপ্‌সা গরম। ভিজে গামছায় বুক মুছে যতীন বললে।

—কাল কল্যাণেশ্বরীতে বৃষ্টি হলো! বাসুদেবও কপালের ঘাম মোছে।

—পাহাড়ি জায়গা তো ; ওখানে তুই এতো গরম পাবি না।

—কই, দিনের বেলায় এমন আর কম কি ? রাত্তিরে অবশ্য ঠাণ্ডাই।

—কোথায় ছিলি রাত্তিরে ?

—মন্দিরে। বেশ লাগলো। এক সাধুর সঙ্গে দেখা : কথাবার্তা বললাম অনেকক্ষণ। বয়স হয়েছে তাঁর। আশ্রম আছে দেওঘরের দিকে। গৃহী অথচ সাধু। আশ্চর্য ! বাসুদেব কেমন যেন আনমনা হয়ে ওঠে।

—ব্যাস্ আর কি ! সাধু মানুষ, বয়স হয়েছে, আশ্রম আছে তুই একেবারে গলে গেলি ! যতীন জোরে হেসে উঠলো, 'দীক্ষাটাও চট্ করে নিয়ে নিলি, কি বল্ ?'

বাসুদেব ওর স্বভাবমত মুচকি হাসি হেসে মাথা নাড়লো।

—ওঁর আশ্রমে আপনার একটা জায়গা হলো না ? মলিনা ঠোঁট কুঁচকে হাসলো।

মলিনার মুখের হাসি তার কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা ঢাকতে পারলো না। বাসুদেব আবার আড়চোখে তাকালো। তেমনি ভাবেই মাথা নাড়লো আবার, 'না। আমি তো জায়গা খুঁজিনি।'

—খুঁজলেই পারতেন। আশ্রম না হলে সন্ন্যাসীদের মানাবে কেন ! হাতের পাখা জোর হয়ে ওঠে মলিনার।

আশ্চর্য, এতো জোরে বাতাস করছে মলিনা তবু যতীন ঘামছে। বাসুদেবের মুখের ঘাম কিন্তু শুকিয়ে গেছে।

—আমি তো সন্ন্যাসী নই। বাসুদেব আস্তে আস্তে বললে।

—সন্ন্যাসী নন্ তো গেরুয়া পরেন কেনো ? মলিনার রুক্ষ দৃষ্টি বাসুদেবের দৃষ্টির সঙ্গে মিলে যায়।

—এমনি। ভালো লাগে তাই। সুবিধেও তো কম নয়। বিনি টিকিটে ট্রেণে চড়ি—কারুর বাড়িতে গেলে দু'বেলা অন্নও জুটে যায়। এ ও প্রণাম করে—দু'চার পয়সা দেয়। মন্দ কি ! দিন তো চলে যাচ্ছে ! বাসুদেব যেন কৌতুক করছে—এমনি ভাবে কথাগুলো বলে। পরিহাসের তরলতা তার গলায়। পরিচ্ছন্ন হাসি হেসে বাসুদেব এবার যতীনকে বলে, 'কি রে, ঠিক বললুম না ?'

—উঁহুঁ ! নেহাতই বাজে কথা ! যতীন উত্তর দেয়।

—কি রকম ?

—ওর আর কোনো রকম নেই ! ঘরে মা নেই, থাকলে

তোর বিয়ে দিতো। তখন বউয়ের ভেঁড়ুয়া হতিস। বউ নেই তাই গেরুয়া ধরেছিস। যতীন বললে মুরুব্বি চালে। তাকালো মলিনার দিকে।

ঘরের মধ্যে আস্তে আস্তে যে ভারী আবহাওয়া জমে উঠেছিলো যতীনের কথা আর হাসিতে তা অনেকটা ফিকে হয়ে এলো। সশব্দে হেসে উঠলো বাসুদেবও।

মলিনাও হাসলো। তবে তার হাসি শব্দবহুল নয়—এমন কি কৌতুক-স্নিগ্ধ সহজ সাদা হাসি যে তাও নয়। বরং মলিনার ঠোঁটের কোণে যে বাঁকা হাসির রেখা ফুটে উঠলো তার জের টেনে ও কথা বললে বাঁকা সুরেই, "বেবাগী লোকের বউতে কি যায় আসে? কথায় আছে না, তাই, 'থাকলে সব, না থাকলে পর'।"

বেফাঁস কথাটা মলিনার মুখ থেকে কেমন করে যে বেরিয়ে গেল সে বুঝতেও পারলে না। জিবকে রাশ বেঁধে সব সময় কি রাখা যায়—কখনো-সখনো আলগা হয়ে যায় বইকি!

কথাটা কারও কান এড়ায় নি। যতীন ভাতের থালা থেকে হাত উঠিয়ে তাকালো মলিনার দিকে। সোজাসুজি চোখে তাকালো বাসুদেবও।

ক'টা মুহূর্ত। নিঃশব্দে তিনটি প্রাণী মনের ফেনা মাখলো নিজেদের মনেই; বিমূঢ়, বিব্রত হয়ে। শেষ পর্যন্ত মনের ফেনায় মলিনার চোখের কোণে কেমন করে যে জল এসে পড়লো, করকরিয়ে উঠলো দুই চোখ, কে বলবে, কে জানে!

পাখা মাটিতে নামিয়ে রেখে উঠে পড়লো মলিনা। দালান

থেকে ঘরে এসে ঢুকলো। বুকটা অযথাই ধড়ফড় করছে। ব্যথার মোচড়ে বুকের হাড় ক'টাও কনকনিয়ে ওঠে।

বিকেল হতে না হতেই মলিনা ঘর-দোর পরিষ্কার করে উনুন ধরিয়ে দিলে। আনাজের ঝুড়ি নিয়ে কুটনো কুটতে বসলো দালানে। দমকে দমকে ধোঁয়া আসছে। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে মলিনা। ভিতরে বিছানায় বসে বাসুদেব 'সদ্‌গুরুসঙ্গ' পড়ছে।

দালান ভরে কটু ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়লো—আর সেই ধোঁয়ার মাঝে বসে থাকলো মলিনা অনেক—অনেকক্ষণ। ধোঁয়া যখন সরে গেল, বাতাসে চোখ মেলে মলিনা দেখে উনুন তার ধরে উঠেছে দাউ দাউ করে। চোখের জলে মনটাও থিতিয়ে গেছে। মলিনা মরমে মরে যাচ্ছে এখন।

তাড়াতাড়ি চা তৈরি করলে মলিনা। ধবধবে কাঁচের গ্লাসে চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো; 'কই, নিন, চা নিন!' হাত বাড়িয়ে দিলে মলিনা।

বই থেকে মুখ তুলে বাসুদেব আনমনা-চোখে তাকালো। 'সদ্‌গুরু সঙ্গে'র সঙ্গী মন যে নিঃসঙ্গ নয়—এ কথা মনে করতে বাসুদেবের খানিকটা সময় লাগে। চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে বাসুদেব প্রশ্ন করলে, 'বিকেল হয়ে গেল নাকি?'

—তো কি আপনার আমার জন্যে বসে থাকবে? মৃদু হাসলো মলিনা। শাড়ির আঁচলে 'সদ্‌গুরুসঙ্গ' ঢেকে নিয়ে বললে, 'চা খেয়ে আমার একটা কাজ করে দিন তো দেখি।'

—কি কাজ? জানতে চায় বাসুদেব।

—একটু বাজার যেতে হবে। মলিনার স্বরে লজ্জা।

— তা বেশ তো।

নিজেকে আরও স্পষ্ট, ব্যক্ত করার আশায় মলিনা বলে, আপনার বন্ধু ফিরে আসতে সন্ধে হয়ে যাবে। ততক্ষণ অপেক্ষা করলে আমার আর যাওয়া হয় না—হাঁড়ি আগলেই বসে থাকতে হবে। রান্নাবান্না শেষ করে রাখি। উনি এলেই আমরা আজ আপনার সঙ্গে আশ্রমে বেড়াতে যাবো।

একটু হয়তো অবাকই হয়েছিলো বাসুদেব। কিন্তু সবাক হলো যখন, তখন তার গলার সুরে সহজ একটা প্রশ্নই শোনা গেল.

—আশ্রমে যাও নি কখনো ?

—একটিবার শুধু। ঠাকুরের আরতি হয় শুনেছি—দেখি নি। আজ চলুন, দেখে আসি। উৎসাহ জানালো মলিনা।

—বেশ তো, চলো।

বেশ খুসিই হয়েছে মলিনা। ওর মুখ দেখে তাই অন্তত মনে হয়। তাকের ওপর 'সদ্‌গুরুসঙ্গ' তুলে রেখে মলিনা এবার বললে, 'এতোক্ষণে নিশ্চিন্ত হলাম, যা ভয় হচ্ছিল।'

—কেন ?

—আমি ভাবলাম আপনি বুঝি খু-ব রেগে রয়েছেন— মলিনা নতচোখে বললে হাতের আঙুলে আঁচল জড়াতে জড়াতে, 'তখনকার কথায় রাগ করেন নি তো ?'

বাসুদেব তার অভ্যাস মত নীরবে হাসে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মলিনার মাথা থেকে ঘোমটা খসে পড়েছে।

ক্লান্ত কপালে ফিকে সিঁদুরের টিপ ; আরও যেন কিছু—একটু মমতা, হয়তো বা করুণা। সব মিলে মিশে মনমরা একটি মুখ।

—পাগল, রাগ করবো কেন ?

সবেমাত্র গা ধুয়ে কাপড় চোপড় ছেড়ে মলিনা ভব্য হচ্ছে ; ওদিকে সন্ধের আবছা অন্ধকার দালান পেরিয়ে জুড়ে বসছে ঘর ; উঠোনে তুলসী গাছের চারার তলায় প্রদীপটা জ্বলছে তখনও কেঁপে কেঁপে, হঠাৎ দমকা একটা ঝড় এলো যেন।

হুড়মুড় করে সদর দরজা পেরিয়ে যতীন উঠোনে পা দিয়েই হাঁক দিলো, কই গো, শীঘ্রি তোমার রান্না সারো।

উঠোনে বেতের মোড়া টেনে বসেছিলো বাসুদেব। মলিনা ঘরে প্রসাধন সারছে তখনও।

—এই যে তুই বাড়িতেই আছিস ? ভালোই হলো। বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে বললে যতীন, ভাগ্যিস্ তুই ছিলি, না হলে আচ্ছা এক বিপদে পড়া যেতো।'

স্বামীর ডাক শুনে মলিনা দালানে এসে দাঁড়ালো। স্ত্রীর দিকে এক লহমা তাকিয়ে যতীন বললে, চট্ করে তোমার রান্নাটা সেরে নাও তো। দুটো মুখে দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। সারা রাত ট্রেনের ধকল সইতে হবে। ভালো কথা, আমার ধোয়ানো কাপড়-চোপড় বাক্সে আছে না কি কিছু ?

মলিনা অবাক হয়ে স্বামীর পানে তাকিয়ে থাকে। বুঝতে পারে না হঠাৎ ধকল সওয়ার কারণ কি ঘটলো। একটু ভয়ই হয়। বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে না কি !

—হঠাৎ ট্রেণ ? যাবি কোথায় ? প্রশ্ন করে বাসুদেব।

—কলকাতা। দ্রুত, উত্তেজনা-ভরা গলায় বলতে থাকে যতীন, 'অফিসে চিঠি এসেছে আমাদের পাঁচ টাকা করে ডিয়ারনেস বেড়েছে এপ্রিল মাস থেকে। গত এপ্রিল থেকে এই এপ্রিল। পাক্কা এক বছর পাঁচটাকা করে পাবো—মানে তোর ষাট্ টাকা। অনিলবাবুকে দিয়ে আজই বিল করিয়ে নিয়েছি। সাহেবও সই করে পাশ করে দিয়েছে। কাল হেড অফিসে পৌঁছে বিলটা দেবো; আমাদের টাকাটি নেবো, আর ব্যস্ রাত্রে ট্রেণে উঠবো। ভাগ্যিস তুই ছিলি, নয়তো কি আর একা ফেলে যাওয়া যেতো!...কই গা, একটু চা খাওয়াবে না? আর হ্যাঁ, কথা বলছো না যে, কাপড়-চোপড় নেই?

—আছে। মলিনা থমথমে গলায় বললে।

ফিরে গিয়ে নিভে আসা উনুনে চায়ের জল চড়াচ্ছে, শুনলো বাসুদেব বলছে, 'দেখ্ তো কাণ্ড। আমি কোথায় ঠিক করে রাখলাম কাল সকালে যাবো, তা তুই সব ভেস্তে দিলি!'

—কাল সকালে তুই যাবি? কোথায় যাবি? যতীন বিস্মিত হয়।

—কোথায় তা কি ঠিক করে রেখেছি? তবে কালই বেরিয়ে পড়বো ঠিক করে রেখেছিলাম। এখানে অনেকদিন থাকা হয়ে গেল, প্রায় তিন হপ্তা।

—আরে নে তোর তিন হপ্তা। যাবি যাস না, আমি তোকে আটকাচ্ছি? কালকের দিনটা থেকে যা। পরশু দিন সকালে আমি ফিরে আসছি, তারপর যাস্।

স্বামীর জন্যে চা ঢালতে ঢালতে মলিনা সব শুনলো, প্রত্যেকটি কথা। মনটা তার হঠাৎ তিক্ত হয়ে উঠছে আবার।

যতীনের হাতে চা তুলে দিয়ে মলিনা বললে, বাক্স থেকে কাপড়-জামা কি বেছে নেবে, নাও এসে।

কাপড় জামা বেছে নেওয়ার কিছুই ছিলো না। এ শুধু একটা অজুহাত। যতীন ঘরে এলো। বাক্স খুলে হাঁটু গেড়ে বসলো মলিনা। এক হাতে তুলে ধরলো লণ্ঠন। আলোটা কিন্তু বাক্সের চেয়ে মলিনার মুখকেই বেশি আলোকিত করেছে।

—বা, বেশ দেখাচ্ছে তো তোমায় আজ। স্ত্রীর গম্ভীর অথচ সুশ্রী মুখের দিকে তাকিয়ে যতীন বললে।

—দেখাক্, তোমার কি! আমার মুখ দেখবার জন্যে তো আর তুমি বসে থাকবে না। নাও, তাড়াতাড়ি করো, আমার কাজ আছে।

মলিনা যে চটে উঠেছে সে কথা বুঝতে যতীনের দেরি হয় নি। আমতা আমতা করে যতীন অফিসের সব কথা বুঝিয়ে বললে আবার। শেষে মলিনার গাল ধরে বললে, ছি, অবুঝ হয়ো না। গরীব লোক আমরা। যে কটা টাকাই পাই না কেন হাতে না পাওয়া পর্যন্ত ঘুম হবে না। কত লোকের কত দরকার, এই টাকাটা পেলে কাজে লাগবে সকলেরই।

—তা যাও না কলকাতা, আমি কি বাদ সাধছি! বললে মলিনা অভিমানভরে মুখ সরিয়ে নিয়ে।

—বাদ না সাধলেও বাধা দিচ্ছ।

—মোটেই নয়।

—বেশ, তবে বলো তোমার জন্যে কি আনবো কলকাতা থেকে ?

—কি আর আনবে ! বেশ মোটা দেখে দড়ি কিনে এনো খানিকটা। থমথমে গলায়, চোখে জল ভরে বললে মলিনা, খুব আস্তে আস্তে।

কাজকর্ম সেরে মলিনা যখন ঘরে ঢুকলো রাত তখন খুব বেশি নয়। তবু এ পাড়াটা নিস্তব্ধ, নিঝুম হয়ে গেছে। রোজই যায়। রোজ তবু এ বাড়িটা অন্তত আরও খানিকক্ষণ সজাগ থাকে। কথায়, চীৎকারে, হাসিতে এতটুকু বাড়ি সরগরম করে রাখতে যতীনের জুড়ি নেই। খাওয়া সারতেই তো একঘণ্টা। মলিনার সঙ্গে যতো রাজ্যের অফিসের গল্প করবে যতীন। তারপর বন্ধুদের কথা—কী হয়তো বাড়ির। শুতে এসে তুজনায় কতো যে খুনসুটি তার কি শেষ আছে। বাতি নিভিয়ে বক্‌বকমের শেষ হতে কি-বা এমন কম রাত হয়। আজ সব চুপ। অনেকক্ষণ হলো যতীন চলে গেছে। এতোক্ষণে গাড়িই হয়তো স্টেশন ছেড়ে চলে গেলো।

মুখে তু'চার কুচি সুপুরি পুরে মলিনা দরজা ভেজিয়ে দিলে। একবার শুধু দেখে নিলে বাসুদেব শুয়েছে কি না। না, বাসুদেব এখনো শোয় নি। উঠোনে দড়ির খাটিয়ার ওপর চুপ করে বসে। আকাশের দিকে তাকিয়ে গুনগুন করে কি যেন গাইছে। কীর্তনের সুরের মতই কানে লাগে। চাঁদের আলোয় সারা উঠোন ভেজা। বাসুদেবের চোখ মুখ পর্যন্ত

স্পষ্ট দেখা যায়। দরজা বন্ধ করে দেয় মলিনা। খিল আঁটে। হঠাৎ কি যেন খেয়াল হয় তার, আবার খিল খোলে। মেঝে থেকে লণ্ঠন তুলে নিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করতে থাকে। খিল আঁটে আর খোলে। একটু যেনো নড়বড় করছে খিলটা। বাইরে থেকে ধাক্কা দিলে খিল হয়তো ভেঙেই যাবে। যা ফাঁক দরজায়—পেরেক কী পাতলা লোহার শিক গলিয়েই তো খিল খোলা যায়। মলিনার বুকটা হঠাৎ ধড়াস করে ওঠে। ছুর ছুর করতে থাকে বুক। ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। দরজা ভেজিয়ে খিল এঁটে দেয় তাড়াতাড়ি।

এতো ভয় কিসের তার—কে আসবে ঘরে, রাতদুপুরে? মলিনা ভাববার চেষ্টা করে। কে আসবে তা ভাবতে গেলে প্রথমেই চোখের ওপর ভেসে ওঠে যে—সে ওই উঠোনে বসে। আর কারুর কথা তো মনের কোণেও উঁকি দেয় না। তবে? এ ভয় কি বাসুদেবের জন্যে? কিন্তু বাসুদেব—

স্বামীর ওপর ভীষণ রাগ হয় মলিনার। এ কি? বন্ধু, তোমার বন্ধু—আমার কি! পা ফেলতে জায়গা নেই এমন এক ফালি ঘর—সেই ঘরে—দিনের পর দিন বন্ধুকে শুতে, খেতে, বসতে ঠাঁই দাও। কি অসুবিধেই যে হয়। আড়াল আবডাল বলে কিছুই নেই—বাইরের লোকের কাছে নিত্যি ওঠা, বসা, কথা বলা।

বাসুদেবও যেনো কেমন! সেই এসেছে তো এসেইছে; যাবার নামটি করে না। হঠাৎ এলো, যতীনের খোঁজখবর নিয়ে। একই গ্রামে নাকি ওদের বাড়ি, একই সঙ্গে ছেলেবেলা

থেকে মানুষ। বাড়িতে বাড়িতে জানা-শোনা—দহরম-মহরম। বাসুদেবের মা মারা যাবার পর ঘরে তালা দিয়ে ছেলে বিবাগী হয়ে যায়। আর গ্রামে ফেরে নি। যতীনের বিয়ের কথা কার মুখে যেন শুনেছিলো—ঠিকানা জেনে নিয়েছিলো—তারপর হাজির হয়েছে উটকো ভাবেই।

স্বামীর কাছে কথায় কথায় মলিনা শুনেছে বাসুদেবের নাকি কোন এক ডানা-কাটা পরীর সঙ্গে বিয়ে হবার কথা হয়েছিলো। সব ঠিকঠাক, হঠাৎ বাসুদেবের মা শুনলেন—মেয়েটি বালবিধবা। বাসুদেব জানতো। বিয়ের ইচ্ছেটা তারই। তবু মা গোপন কথাটা জানতে পেরে আঁ্যাৎকে উঠলেন। হ'লই বা সুন্দরী—সমাজ, ধর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে সুন্দরী ঘরে আনতে হবে এমন কথা কেউ কি শুনেছ'? না—তা হবে না। বাসুদেবের মার দৃঢ় আপত্তি। ওদিকে বাসুদেবেরও গোঁ। হ্যাঁ-না-এর টানা-পোড়েন চলছে এমন সময় হঠাৎ বাসুদেবের মা মারা গেলেন; ছেলেও গৃহত্যাগ করলে।

কি যে ত্যাগ করেছে বাসুদেব—মলিনা তাই ভাবে। কে বলবে ও ঘর ছেড়েছে? এই কি ঘর ছাড়ার লক্ষণ? নিজের ঘর ছেড়েছে বটে কিন্তু জুড়ে বসেছে অপরের ঘর, অপরের ঘরণী।

কথাটা মনে হতেই মলিনার চোখদুটো কপাটের খিলে আঁটকে গেলো। আবার দুরু দুরু করতে লাগলো বুক। সত্যি, লোকটা যেন কেমন! প্রথম যে দিন এলো, ওর চেহারা আর কাঁধ-পর্যন্ত চুলের বহর দেখেই মলিনার মন বিষিয়ে গিয়েছিলো। তারপর প্রথম প্রথম সে কি কাছে ঘেঁষার ঘটা। উঠতে বসতে

মুচকি-মুচকি হাসা, আস্তে আস্তে ওর নাম ধরে ডাকা—মলিনা, ও মলিনা।···আর এমন ভাবে লোকটা তাকাতো যেনো মলিনা ওর কতো জন্মের চেনা, কতোই না আপন-জন।

প্রথম দর্শনেই যাকে দেখে পিত্তি জ্বলে গিয়েছিলো তার গেরুয়া-বসনের ঘটাপটায় ভেক্‌ভড়ং ছাড়া আর কিছু যে আছে মলিনা তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে নি। আজও পারে না। কেনই বা না হবে? সবল সুস্থ মানুষ, এ সংসারে তার কোনো কাজ নেই গা? বন্ধুর ঘাড়ে বসে খাবে আর তার বউয়ের দিকে চোরা-চোরা তাকাবে? তাও যদি বন্ধু বড়োলোক হতো। একে তো নিজেদেরই চলে না; আনতে, খেতে, পরতে শুধু নেই নেই, তবু পরের জন্য ধার করো আর মরো।

রাগ শুধু নয়, যতীনের ওপরেও মলিনার মন বিষিয়ে ওঠে। একি! কোথাকার কে—তার জিম্মায় ঘর ছেড়ে, বউ ছেড়ে দিব্যি তুমি চলে গেলে। কিছু যদি একটা হয়!

মাঝরাতে মলিনা হয়তো কখন ঘুমিয়ে পড়বে—আর হঠাৎ যদি দরজা খুলে ওই—!···ভয়ে মলিনার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ঘাম জমতে থাকে ঘাড়ে, কপালে।

হঠাৎ কি মনে হতে মলিনা ইঁদুর-মারা কলটা বেঞ্চির তলা থেকে বের করে নেয়। প্রাণপণে তার তীক্ষ্ণধার ফলা দুটি খোলে। তারপর আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে ইঁদুর-মারা কলটা দরজার চৌকাঠের ঠিক মাঝখানেই রেখে দেয়।

বাতির শিখা কম করে বিছানায় শুয়ে পড়ে মলিনা।

চোখের দৃষ্টি মেলা থাকে দরজার ওপর—আলকাতরা-রাঙানো কালো-কাঠ পুরু একটা যবনিকার মতন ভাসতে থাকে।

কখন যেনো চোখের পাতায় তন্দ্রা নেমেছিলো—হয়তো শেষ রাতেই। কিসের একটা খুট্ করে শব্দ হতে ধড়মড় করে উঠে বসলো মলিনা। কই, কিছু না তো? তবে? অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর মলিনা অত্যন্ত সন্তর্পণে দরজা খুলে উঠোনে চোখ মেলে তাকালো।

ভোর হয়ে আসছে। ফরসা হয়ে গেছে আকাশ। বাসুদেব ঘুমিয়ে।

পা টিপে টিপে উঠোনে নেমে এলো মলিনা। বাসুদেব ঘুমোচ্ছে। তার চোখের পাতায় ভোর বেলার প্রগাঢ় ঘুম, ঠোঁটের কোলে একটু মিষ্টি হাসি। হয়তো স্বপ্নই দেখছে। কার স্বপ্ন?···মলিনা হঠাৎ চমকে ওঠে, শিরশিরিয়ে যায় ওর সর্বাঙ্গ। শাড়ির আঁচলটা গায়ে জড়াতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হয়—কাল আশ্রমে বেড়াতে যাবার জন্যে মলিনা যা সাজগোজ করেছিলো এখনো সে সবই তার দেহে। সেই শাড়ি, ব্লাউজ, সেই কুমকুমের টিপ, পায়ের আলতা। এখনো গায়ে সেণ্টের ফিকে গন্ধ।

আশ্চর্য, রাতে শোবার আগে শাড়ি ব্লাউজটাও খুলে রাখে নি? কেন এমন ভুল?

আঁচলটা আঙুলের পাকে জড়াতে জড়াতে মলিনার কেমন যেনো মনটা ফাঁকা হয়ে যায়, বুকের মধ্যে একরাশ বাতাস পাক খেতে থাকে।

তেমনি মন নিয়েই মলিনার সারা দিন কেটে যায়। আনমনা, ফাঁকা। টুকটাক কাজ-কর্মে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চায় ; পারে না। দুপুরে গরম পড়ে—অসহ্য গরম। মলিনার মনের জ্বালাও মন থেকে দেহে ছড়িয়ে পড়ে। বার দুয়েক গা ধুয়ে নেয়। একটু যদি জুড়োয় শরীর।

দুপুরের একটু পর থেকেই মেঘ জমতে থাকে। বিকেলের গোড়ায় ঘোর হয়ে আসে আকাশ। ধূলো বালির ঘূর্ণি ওঠে, তারপর জল নামে অঝোর ধারায়। ক'দিন ধরে যা গরম পড়েছে তাতে বৃষ্টি হবে এ এমন কিছু আশ্চর্য নয়—কিন্তু এই বৃষ্টি দেখে মলিনার মুখ আরো কালো হয়ে ওঠে।

আবার রাত। নিস্তব্ধ, নিঝুম হয়ে আসে তালপুকুরের পাড়া। সমানে বৃষ্টি পড়ছে। কখনো ঝিমিয়ে আসে, কখনো জোর হয়ে ওঠে। ছেদ নেই! ছন্নছাড়া এলোমেলো বৃষ্টির ছাট আলুথালু ক'রে মলিনাকে ভিজিয়ে দিয়ে যায় ; ভিজে জল থৈ থৈ করতে থাকে দালান। উঠোনে জল দাঁড়িয়ে যায়।

এমন ভাবনায় আর কখনো পড়েনি মলিনা—সমস্যাটা খুবই কঠিন। তবু সে সমস্যা তেমনি ভাবেই সমাধান করতে হয়—ঠিক যেমন ভাবে বাসুদেবের মা ছেলের বিয়ের সমস্যার সমাধান করেছিলেন। জলে গলা পর্যন্ত ডুবে যাক, দালানে দাঁড়িয়ে থাক বাসুদেব, তবু এক ঘরে মলিনার সঙ্গে তার শোয়া চলে না।

মুখ ফুটে বলতে হয় নি মলিনাকে, বাসুদেব নিজেই দালানের একটু কোণ ঘেঁসে দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে পড়লো।

আজ যেনো আরও ভয় করেছে মলিনার। আকাশই শুধু কালো নয়, বৃষ্টির জলই শুধু জল নয়, মলিনার মন রাতের প্রতিটি প্রহরে প্রহরে যতো রাজ্যের কালি শুষে শুষে কালো হতে লাগলো ; আর চোখের জলে সেই কালো গলে গলে ওর সর্বাঙ্গে কালিমা মাখালে।

কে ? কিছু না, বাতাস !…কে যেনো হাঁটছে দালানে ; জলে পা পড়ার শব্দ, পা টানার আওয়াজ। কার চোখ বুঝি দরজার ফাঁক দিয়ে চেয়ে আছে। কি দেখছে ও ? মলিনাকে ? অষ্টাদশী মলিনা ভয়ে লজ্জায় আঁট হয়ে থাকে। ধুক্‌ধুক্‌ করে বুক, হাত-পা কাঁপে, অবশ হয়ে আসে।

কতো রাত এখন ? গভীর রাত নিশ্চয়। যতীন নেই। কলকাতায়। না, কলকাতায় নয়, গাড়িতে। বাড়ি ফিরছে যতীন। পকেটে টাকা। মলিনা আরও কটা টাকা জমাবে এবার। বাঁচিয়ে-বুঁচিয়ে লুকিয়ে এ ক'মাসে প্রায় গোটা তিরিশেক টাকা জমিয়েছে। এবার যদি আরও কিছু জমায়— ভারী দুটো কানবালা গড়াবে মলিনা। বড় সখ তার। কিম্বা একটা সেই শাড়ি কিনবে—পূর্ণিমার মতন। কিন্তু যতীন যদি তাকে টাকা না দেয়—যদি পুরো টাকাটাই পাঠিয়ে দেয় তার বাবাকে, গলসীতে। না, কখনোই তা হবে না। পাঠিয়ে দেখুক যতীন ; যাচ্ছে-তাই ঝগড়া করবে মলিনা এবার। বিয়ে করেছো, কচি খোকাটি নও, তবু বউয়ের জন্য দরদ নেই তোমার। শুধু দুবেলা দুটি ডাল-ভাত আর মিষ্টি কথা ? একটা পয়সাও যদি হাতে তুলে দিয়ে থাকে কখনো ; একটা কিছু

কিনে থাকে নিজে সখ করে। কষ্টেসৃষ্টে যা বাঁচাবার মলিনাকেই বাঁচাতে হয়েছে লুকিয়ে-চুরিয়ে। চুরি? কথাটা মনে হতেই মলিনার বুকটা ধক্ করে ওঠে। চুরি ছাড়া কি? চুরিই বলে একে। যতীন জানে না, মলিনা লুকিয়ে টাকা জমায়; লুকিয়ে এটা ওটা কেনে। হোক না তা দু-চার আনা কী দু এক টাকা। কালও যাবার সময় যতীন চেয়েছে; চেয়েছে র‍্যাশন আনতে, চেয়েছে কলকাতা যাবার সময় দু-চার টাকা ট্রেণে হাত খরচের জন্যে। মলিনা দেয় নি। বলেছে 'টাকা কই, কোথায় পাবো?'

শেষ পর্যন্ত যতীন বাসুদেবের কাছ থেকে কটা টাকা নিয়ে গেছে। বাসুদেব! এই লোকটাকেও আজ তিন হপ্তা ধরে চোব্য-চোষ্য খাওয়াতে হচ্ছে। কোথাকার কে, তার জন্যে গতর দাও, নিজেদের মুখের ভাত তুলে দাও। এক পো দুধ পেলে যতীনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির খানিকটা যেন পূরণ হয়—কিন্তু তার কপালে এক ঝিনুকও দুধ জোটে না, অথচ বাসুদেবের বেলায় দুধ চাই। কেন? কে তার বাসুদেব?

যতীনই বা কে, যতীনের বাবা-মাই বা কে মলিনার? মলিনা কি তার স্বামীকে দুধ খাওয়াতে পারে না? একটু ঘি বা একটু বেশি মাছ। কানবালার জমানো টাকা, ব্লাউজের ছিট, পাড়াপড়শীর সঙ্গে মাঝদুপুরে সিনেমা যাওয়া। মাসে এই কটা টাকাও তো বাঁচিয়ে স্বামীর জন্যে ব্যয় করতে পারে মলিনা। শ্বশুর শাশুড়ীর ওপরেই বা এতো রাগ কেন?

মলিনার মাথা গরম হয়ে ওঠে ভাবতে ভাবতে। এমন

ভাবে কোনদিন সে ভাবে নি। এত তার ভয় হয় নি নিজের জন্যে। আজ যেনো সব একে একে খুলে যাচ্ছে—মনের যত গ্লানি, জট। স্বামী তার, স্বামীর সংসার তার, কর্তৃত্ব তার। সব পেয়েছে মলিনা. কিন্তু পেয়েও মন কি তার কাণায় কাণায় ভরে উঠেছে? না। স্বামী আর সে ছাড়া আর কিছুই তার সহ্য নয়। আর যা আছে সবই তার চিন্তার গণ্ডী থেকে দূরে।

কে ডাকলো না! মলিনা ধড়মড় করে উঠে বসলো। সম্বিত ফিরে পেয়েছে এতোক্ষণে। কান পেতে শুনলো—বাইরে আবার অঝোর ধারায় জল নেমেছে; আকাশ-ভাঙ্গা বৃষ্টি। ঘরের বাতিও প্রায় নিবু-নিবু।

কে যেনো দরজায় ঠেলা দিচ্ছে! একটু পরেই আধো-আলো-অন্ধকারে একটা মুখ ভেসে উঠবে। ইঁদুরকলটা পাতা আছে তো দরজার গোড়ায়? আছে।

বিবর্ণ মুখে বসে থাকে মলিনা দরজায় চোখ রেখে, রুদ্ধ নিশ্বাসে। মিনিটের পর মিনিট কেটে যায়—কই, কেউ তো আসে না। কেউ না।

আজও এলো না তা হলে!

জানালা দিয়ে আকাশ দেখলো মলিনা। শ্লেট্-রঙের আকাশ। ভোর হলো এই; বৃষ্টি থেমেছে।

আস্তে আস্তে দরজা খুলে দালানে পা দেয় মলিনা। জলে ভেসে যাচ্ছে দালান। এক কোণে সিক্তবাস সিক্তদেহ বাসুদেব গালে হাত রেখে চুপ করে বসে আছে। কে যেনো সপাং করে

একটা চাবুক কষিয়ে দিলে মলিনাকে। জ্বালা ধরে গেলো সর্বাঙ্গে। হাত পা অসাড় হয়ে এলো ক্ষণেকের জন্যে। কোমর পর্যন্ত জলে ডুবে যে লোকটা পাথরের মত বসে আছে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মলিনার মনে হলো—বড্ড ছোট ঘরে ও বাস করে, বড্ড ছোট মন নিয়ে। নোংরা মন। ইঁদুর কি!

বাসুদেবের পাশে এসে মলিনা ডাকে, 'একি? এমনি ভাবে বসে আছেন সারা রাত?'

বাসুদেব চোখ তুলে তাকায়। চোখ দুটো তার জবা ফুলের মত লাল। বাসুদেবের হাত ধরে মলিনা।

—ছি ছি। আপনি কি বলুন তো! সারা রাত এ ভাবে বসে থাকলেন? একবার তো ডাকতে হয়! আমিও মরণ ঘুম ঘুমিয়েছি।

বাসুদেব তেমনি ভাবেই তাকায়। মলিনার চোখে মুখে কোথাও কি ঘুম লেগে আছে?

—গাটাও খুব গরম মনে হচ্ছে! উঠুন। আসুন আমার সঙ্গে। মলিনা বাসুদেবের হাত ধরে টানে।

সেদিনই মাঝরাত্রে যতীনের পাশ থেকে উঠে মলিনা দরজার খিল খুলতে গেল নিঃশব্দে। কে জানতো, আজও দরজার গোড়ায় ইঁদুরকল পাতা আছে। মনেও পড়ে নি ঘুণাক্ষরে মলিনার। ইঁদুর কলে পা পড়লো ওর। করাতের দাঁত কামড়ে ধরেছে মলিনার পা। কঠিন কামড়। পায়ের পাতা যেন থেঁৎলে

গেল। কী তীব্র যন্ত্রণা! ককিয়ে উঠলো মলিনা। যতীন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কোনো সাড়া শব্দ নেই।

কেমন করে যে মলিনা বাতি জ্বেলেছে; অসহ্য যন্ত্রণা সম্বরণ করেছে দাঁতে দাঁত চেপে, কেউ তা জানতে পারলো না।

পরের দিন একটু বেলায় গম্ভীর মুখে যতীন একটা রিক্সা ডেকে আনলো। গায়ের মোটা চাদরটা জড়িয়ে কাঁধের থলে কাঁধে ফেলে বাস্থদেব বললে, 'আসি রে! বেশ কাটলো ক'দিন। আবার আসবো কখনো।'

—খবরদার! এ বাড়িতে জীবনে আর পা দিবি নে, তোর গুরুর দিব্যি! আমি তোর কে?

—বন্ধু। ম্লান হেসে বলে বাস্থদেব।

—থাক্-থাক্ শালা, আর বাক-ফট্টাই করিস্ নে। অনেক ভড়ং দেখলাম। গা ভর্তি জ্বর। বাড়ি ছেড়ে চললেন উনি। কেনো রে? এতোদিন কাটলো, আর কটা দিন তোর এখানে কাটতো না?

—রাগ করিস কেনো? আমার হয়তো বসন্ত হবে। তোদের বাড়িতে বিষ ছড়াবো। তাই। একটু থামলো বাস্থদেব তারপর বললে আবার, 'যাই. দেওঘরের গাড়ি চলে গেলে ফিরে আসতে হবে।'

—দেওঘরে যাচ্ছো? যাও—! ক্ষুদে ক্ষুদে চোখে তাকালো যতীন, 'কোথায় উঠবে? সেই আশ্রমে তো! যদি না উঠতে দেয়?

—পাগল, তিনি আমার গুরু। আচ্ছা আসি। মলিনা

কই—ঘরে ? থাক্ থাক্, আসতে হবে না। চললুম—আবার আসবো।

বাসুদেব গিয়ে রিক্সায় উঠলো। বড় রাস্তা পর্যন্ত বাসুদেবকে এগিয়ে দিয়ে যতীন ফিরে এলো। উঠোনে, দালানে কোথাও মলিনা নেই।

ঘরে ঢুকে যতীন দেখে মলিনা জানালার কাছে চুপটি করে দাঁড়িয়ে।

—কি গো, কি হলো, দাঁড়িয়ে যে ?

স্বামীর গলার স্বরে মুখ ফেরালো মলিনা। চোখ দুটো তার লাল ; ছল ছল করছে।

অবাক হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যতীন বলে, 'কি ব্যাপার কাঁদছো নাকি ?'

মলিনার খেয়াল হয়। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বলে, 'পাটায় বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে।'

মলিনার পায়েব দিকে যতীনের এই প্রথম নজর গেলো। ছেঁড়া কাপড়ে মলিনার পা জড়ানো। বেশ ফুলেছে। কি হয়েছে জানতে চায় যতীন।

মলিনা বলে, ইঁদুর কলে কেটে গেছে।

নিমেষে যতীনের মেজাজ চড়ে যায়।

—কোথায় সেই সর্বনেশে যন্তরটা ? আজ আমি ওকে বাড়ি থেকে বিদেয় করবো।

খাটের তলায় ইঁদুরকল খুঁজতে বসে যতীন।

স্বামীর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মলিনা ধীরে ধীরে বলে, 'খাটের তলায় নেই।'

—কোথায় তবে ?

—ফেলে দিয়েছি জানালা দিয়ে।

চমক্ লাগে যতীনের। দাঁড়িয়ে উঠে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে, 'সত্যি ?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে মলিনা। বলে, হ্যাঁ, সত্যি।

—তা হলে তোমার ইঁদুর—? স্ত্রীর অবোধ্য চোখে চোখ রেখে যতীন থতমত খেয়ে বলে।

স্বামীর কথার জবাব দেয় না মলিনা। মনে মনে ভাবে : ওর ইঁদুর তো বাইরে নেই—ঘরেই রয়েছে। কুরকুর করে কাটছে দিনরাত—কতো যে ক্ষতি করেছে তার কি লেখা-জোখা আছে—না থাকবে কোনও দিন। আরও কতো হয়তো করবে। কিন্তু যতীন একটুর জন্যে বেঁচে গেছে, এই তার ভাগ্যি।

বরফ সাহেবের মেয়ে

'তাহলে একটা গল্প বলি, শোনো—' পাঁচুদা বললেন, 'গল্পটা যদিও সে বয়সের, যে বয়সে আমাদেরও তোমার মতন মরাল-রেস্‌পনসিবিলিটির ভূত ঘাড়ে চেপেছিলো রাসু, কিন্তু আসলে সব মানুষেরই সব বয়সের গল্প সেটা।

আমরা ছিলাম তিন বন্ধু ; বীরু, তিনু আর আমি। কতোই বা বয়স হবে তখন আমাদের, বড় জোর বছর বারো-তেরো। থাকতাম ধানবাদে ; ডোমপাড়ার রেলকোয়ার্টার্সে। পড়তাম পুরোনো স্টেশনের 'এ্যাকাডেমি'তে।

ধানবাদ বাজার ছাড়িয়ে ডোমপাড়া। সে পাড়ায় ঢুকতেই ডানহাতি যে ব্লকগুলো সারবন্দিভাবে দাঁড়িয়ে আছে তারই একটাতে থাকতাম আমি আর একটাতে তিনু। আমার বাবা এবং তিনুর বাবা দু'জনাই ছিলেন রেলের চাকুরে। বীরুর বাবা কাজ করতেন ধানবাদ বাজারের সবচেয়ে চোখ-ধাঁধানো বিরাট এক সাহেবী দোকানে, 'গ্রেগারী ব্রাদার্সে'। থাকতেন কাছাকাছি ভাড়াটে বাড়িতে। মোহিতকাকাবাবু কি কাজ করতেন তা জানি না, তবে বীরু প্রায়ই পকেট ভর্তি করে লজেন্স, টফি, বিস্কুট—এমনি কতো কি নিয়ে আসতো। আর আমরা সেই সব পকেটে করে হাজির হতাম বরফ সাহেবের বাড়ি ; বরফ সাহেবের মেয়ে—জিনির কাছে।

বরফ সাহেব! নামটা শুনে কেমন যেনো লাগছে তোমাদের, না? সেই ছেলেবেলায় আমরাও যখন বরফ সাহেবের কথা প্রথম শুনেছিলুম, কেমন যেন অদ্ভুত লেগেছিলো। যখন ভাব হলো, যাওয়া-আসা শুরু হলো, বৃদ্ধি পেলো অন্তরঙ্গতা, তখন কিন্তু আর অদ্ভুত লাগতো না। আর কেই বা তাঁর নাম দিয়েছিলো 'বরফ সাহেব', তাও জানতে চাই নি, ইচ্ছেই করে নি। আজও জানি না, কি তাঁর আসল নাম।

আমাদের পাড়াতেই, জোড়ফটক যাবার পথে ডানদিকে বিরাট সাদা পাঁচিল-তোলা, ফটক-লাগানো প্রকাণ্ড এক বাড়ি ছিলো। বাড়িটা বরফকলের। ওই পাঁচিলের মধ্যে এক পাশে টালি আর খাপরা-ছাওয়া ছোট্ট একটা কটেজ, অনেকটা দিশি-বাঙলোর মত। গির্জার চূড়োর মত সে বাড়ির মাথাতেও এক চূড়ো ছিলো। লতানো গাছে শ্যাওলা-মাখা সে চূড়ো ঢাকা থাকতো অনেকটা। কতোরকমের ফুল দেখেছি সেই চূড়োর গায়ে।

এই বাড়িতেই থাকতেন বরফ সাহেব। ঝক্‌ঝকে-তক্‌তকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এক কটেজে। সামনের ছোট্ট বাগানে ঋতু-বদলের সাথে সাথে নানান ফুল ফুটতো। বারান্দায় থাকতো ক্রোটনের টব। একটিমাত্র টব ছিলো জিনিয়া ফুলের। একেবারে সাদা—বরফের মত ধবধবে ফুল দেখতাম সেই টবে—একটিই ফুল শুধু। বরফ সাহেব নিজের হাতে কি সব করতেন যেনো, আর সংবৎসর সেই টবে ফুটিয়ে রাখতেন নিঃসঙ্গ একটি জিনিয়া ফুল, একটি-দুটি কুঁড়িও। দুটি ফুল কখনো আমরা

সে গাছে দেখি নি। শুনেছি, দুটি কুঁড়ি ফুটবো-ফুটবো হলেই একটি তিনি কেটে সরিয়ে ফেলতেন। কোথায় তা জানি না। বরফ সাহেবের মেয়ে জিনিয়া—হ্যাঁ, বরফ সাহেবের মেয়ের নাম ছিলো জিনিয়া—আমরা অবশ্য বলতুম জিনি, লোকে বলতো বরফ সাহেবের মেয়ে—সেই জিনি বলতো, একটি ফুল বরফ সাহেব তার মাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দেন। আমরা চোখ বড় বড় করে সে কথা শুনতাম, আর ভাবতাম, বরফ সাহেব নিশ্চয় মন্ত্র-টন্ত্র জানেন।

বরফ সাহেবের বাড়িতে কিসের যেন যাদু মাখানো ছিলো। সে বাড়ির বারান্দায় সকাল থেকেই ছায়া নামতো, সবুজ রঙ্-করা বেতের চেয়ার-টেবিলগুলো সারাদিন অসাড়ে ঘুমোতো, হাওয়ায় হাওয়ায় পর্দা দুলতো ঘরের, থেকে থেকে, খাঁচার টিয়া পাখিটা থেকে থেকে ডেকে উঠতো, দূর থেকে ভেসে আসতো ঘুঘুর ডাক। আর বরফকলের শব্দও নিরবচ্ছিন্ন বেজে চলতো কানের কাছে।

আমরা—বীরু, তিনু আর আমি—আমরা নিত্যই যেতাম সেখানে। বরফ সাহেব আমাদের খুব ভালোবাসতেন। বেঁটে-খাটো, গোলগাল, মাথায় পাকা চুল, চোখে কান-জড়ানো চশমা আমাদের সেই বরফ সাহেবকে আজো স্পষ্ট মনে করতে পারি। আমরা যেনো ছিলাম তাঁর বন্ধু, কি নাতির দল। আমাদের গ্রাউণ্ডে ফুটবল খেলা থাকলে বরফ সাহেব কল থেকে আধ চাঁই বরফ দিয়ে দেন, দিয়ে দেন অমন দশ-বারো বোতল লেমনেড্। একটা রুপোর কাপ কিনে দিয়েছিলেন

তিনি আমাদের। সেই কাপ খেলা হতো ফুটবল সিজনে। বরফ সাহেব ছিলেন তার কর্মকর্তা। ক্রিকেট খেলার মরসুমে তিনি আমাদের ব্যাট, উইকেট, বল-সব কিনে দিতেন। তা ছাড়া, সর্বত্রই তো তিনি আমাদের। সরস্বতী পূজো করতাম ; বরফ সাহেব চাঁদা দিতেন দশ টাকা। নিজে এসে ঠাকুর সাজাতেন, বিসর্জনের সময় সঙ্গে যেতেন সবার আগে, বরফ সাহেবের মেয়ে জিনি এসে অঞ্জলি দিতো।

আমরা তিন বন্ধু বরফ সাহেবকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছি তাঁর বাড়িতে। ফাঁক পেলেই তিনি আমাদের সঙ্গে লুডো, স্নেকল্যাডার, ক্যারাম, হর্স রেস—কতো কি খেলতেন। আমাদের নিয়ে বেড়াতে বেরুতেন বরফকল ছাড়িয়ে ধানক্ষেত আর মাঠের মধ্যে, কবরখানার শেষে যে চাঁদমারি আছে, সেখানে। আমরা ছুটতাম—বীরু, তিনু, আমি আর জিনি। বরফ সাহেব রুমাল উড়িয়ে স্টার্ট দিতেন। খেলতাম কানামাছি। বেশির ভাগ সময় বরফ সাহেব হতেন চোর। তাঁর চোখ বেঁধে দিতাম, আর তিনি ছড়ি দিয়ে দিয়ে বাতাসে আঁক কাটতেন—হ্যাই বীরু, কাঁহা গিয়া ? তিনু, তোকে ধরবো এবার। জিনি—জিনি —শয়তান পাঁচুটা কোথায় রে ?

বরফ সাহেবের বাড়ির আড্ডায় বরফ সাহেবকে সব সময় অবশ্য পেতুম না, পেতুম জিনিকে। জিনি আমাদের জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকতো। সমবয়সী সখি আমাদের। জিনিয়া ফুলের মতই গায়ের রঙ, বরফ সাহেব তাই বুঝি ওর নাম রেখেছিলেন জিনিয়া—জিনি। একরাশ ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া কাঁধ

পর্যন্ত চুল জিনির। কী কোঁকড়ানো আর নরম। ঈষৎ লম্বাটে ধরনের মুখ। টানা-টানা চোখ, মণি দুটো একটু কটা। জিনির গাল-ঠোঁট লাল হয়ে থাকতো। লুডো খেলায় হেরে গিয়ে গলা বেঁকিয়ে জিনি যখন আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করতো, কী অভিমান জানাতো, আমরা ফ্যাল ফ্যাল করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতুম। ফ্রক পরতো জিনি, কতো রঙ-বেরঙের ফ্রক ছিলো তার। আর সেই ফিকে গোলাপী সিল্কের মোজা, ওর নরম দুধ-রঙের পায়ে গা মিশিয়ে যে মোজা আরও মধুর দুধ-আলতা রঙ ধরতো।

জিনি ছিলো আমাদের খেলার সাথী, সুখ-দুঃখের বন্ধু। আমরা গল্প করতাম, খেলতাম, খেতাম। কতোদিন এমন হয়েছে, বীরু পকেট ভরতি করে চকলেট এনেছে, তিনু এনেছে ডাঁসা পেয়ারা, আর আমি স্রেফ তেঁতুলের আচার। জিনির কাছে তিনজনে লজেন্স, পেয়ারা আর তেঁতুলের আচার নামিয়ে রেখেছি। তারপর চারজনে মিলে বারান্দার তলায়, লতা-গাছের ছায়ায় বসে এক সাথে সেইসব সুখাদ্য এবং কুখাদ্য খেয়েছি। মাঝে মাঝে জিনি জিভ বের করে মুখ-চোখ কুঁচকে বলেছে, 'কি ট-ক্!' বীরু বলেছে, 'খাসা'; তিনু বলেছে, 'বেড়ে'; আর আমি জিনির জিভ থেকে আমার জিভে মনে মনে সব টক টেনে নিয়ে বলেছি, 'গ্র্যাণ্ড'।

এই আমাদের জিনি। তিন বন্ধুর মনের বাগানে একটি ফোটা ফুল। তার রূপে, তার গন্ধে, তার খেলায় আমরা মুগ্ধ, আমরা খুশী, আমরা বিভোর। তার চেয়েও বড় কথা বুঝি,

বরফ সাহেবের মেয়ে জিনি আমাদের বন্ধু—এতে আমরা কৃতকৃতার্থ।

অথচ এই জিনি যে সত্যি সত্যি কে, তা আজও জানি না। নানান মুখে নানারূপ উক্তি শুনেছি। ভাসাভাসাভাবে তার মানে বুঝলেও সে কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে বসি নি। জিনির জন্মরহস্য যাই হোক্, বরফ সাহেবের জিনিই ছিলো সব, আর জিনির বরফ সাহেবই সব। তিন কুলে ওদের আর কেউ আছে বলে জানতাম না. কোনদিন আর কাউকে দেখলাম না। জিনির জাত কি, কি তার ধর্ম, কোনটা তার মাতৃভাষা, সেকথা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। বরফ সাহেব নিজে বাঙলায় কথা বলতেন আমাদের সাথে, একটু তাতে উচ্চারণ-বিকৃতি ছিলো, এই যা। আর জিনি, জিনি ইংরিজী পড়তে-লিখতে পারতো যতো না, তার বেশি ওর দখল ছিলো বাঙলায়। জিনি সরস্বতী পূজোতে অঞ্জলি দিতে আসতো, সেকথা তো আগেই বলেছি তোমাদের, দুর্গা পূজো, কালী পূজোতে ঠাকুর দেখে বেড়ানোর উৎসাহও আমাদের চেয়ে তার কম ছিলো না। ওদিকে আবার দেখেছি, জিনির গলায় সোনার সরু হারে একটা ক্রস ঝোলানো।

বেশ ছিলাম ; বীরু, তিনু, আমি আর জিনি। আর—আর বরফ সাহেব।

সুখেরও ঋতুবদল আছে। একথা ছেলেবেলায় প্রথম জানলাম, বরফ সাহেব যেদিন মারা গেলেন। একেবারেই হঠাৎ ; মাত্র একদিনের জ্বরে। বরফকুলের কাছেই ছিলো গ্রেভ ইয়ার্ড—কয়েকটা ধানক্ষেতের ব্যবধানে। বরফ

সাহেবকে সেখানে কবর দেওয়া হলো। সেদিন বরফ সাহেবের বাড়িতে অনেক লোক দেখেছিলাম। সবই সাহেব-সুবো লোক; অবশ্য অন্ত্যজ কুলেরই বেশি। আমরা তিন বন্ধু বরফকলের গেটের কাছে ঠায় দাঁড়িয়েছিলাম চৈত্র মাসের রোদ্দুরে। অতো লোক আর সাহেব-সুবো দেখে ভেতরে ঢুকতে সাহস হয় নি। বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খালি হাঁ করে তাকিয়ে থেকেছি, বিরাট সাদা উঁচু পাঁচিল ভেদ করে কিছু দেখতে পাই নি, কিছু শুনতে পাই নি, শুধু নিমগাছের ডালে সেদিনও ঘুঘুটা ডাকছিলো, আর চৈত্র মাসের ঘূর্ণি-হাওয়ায় উড়ে-আসা ধুলোয় আমাদের মাথা-মুখ-চোখ ভরে উঠছিলো।

বিকেল হয়-হয়—একটা কালো মতন ফুল দিয়ে সাজানো গাড়িতে বরফ সাহেবের মৃতদেহ নিয়ে ওরা চলে গেলো। আমরা শুধু গাড়ি দেখলুম, দেখলুম ফুল আর লোক। আর কিচ্ছু না। জিনি কই? জিনি? চোখ দিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম আমরা—দেখতে পেলুন না জিনিকে।

তিনি বন্ধু ছুটে গেলাম খোলা গেট দিয়ে। সেই বরফ সাহেবের বাড়ি। বারান্দা ফাঁকা, জিনিয়া ফুলের টব ফাঁকা। সব শূন্য, স্তব্ধ, নিঝুম। বীরু ভয়ে ভয়ে ডাকলো, জিনি—জিনি। তিনু ডাকলো, জিনি—জিনি। কোন সাড়া-শব্দ নেই। অধৈর্য হয়েই আমি চীৎকার করে ডাকলুম, জিনিয়া—জিনি।

বারান্দার নীচে লতাগাছের ঘন ছায়া থেকে কে যেনো ডুকরে কেঁদে উঠলো। আমরা তিনজনে ছুটে গেলাম। ওই তো জিনি, আমাদের জিনি। গুম্‌রে গুম্‌রে জিনি কাঁদছে। ফোলা-

ফোলা চোখ তুলে জিনি তাকালো, আর তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কেঁদে উঠলো আবার। তার কান্নায় আমাদের গলাও বুজে এলো। এতক্ষণ যেনো জোর করে আগলে রেখেছিলুম, আর পারলুম না; জিনির পাশে বসে আমরাও কাঁদতে লাগলুম।

কতোক্ষণ কেঁদেছি, খেয়াল নেই। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘন হয়ে এসেছে, তারা উঠেছে আকাশে, তখন জিনির হাত ধরাধরি করে আমরা উঠলুম।

বীরু বললে, রাত্রে এসে সে শুতে পারে। তিনু বললে, সেও। আমিও মাথা নাড়লুম।

জিনি বললে, না, কাউকে আসতে হবে না, আয়া তো তার আছেই।

আমরা তিন বন্ধু ফিরে এলুম।

পরের দিন বিকেলে জিনিকে সঙ্গে করে গেলাম গ্রেভ্ ইয়ার্ডে, বরফ সাহেবের কবর দেখতে। জবা গাছের তলায় বরফ সাহেবের কবর হয়েছে। নতুন কবর। বড্ড ঠাণ্ডা যেনো। কবরের চারপাশে বসে বীরু, তিনু, আমি আর জিনি অনেক কাঁদলুম। উঠে আসার সময় আমরা বুঝি সকলেই মনে মনে বললুম, বরফ সাহেবের না-থাকার দুঃখ জিনিকে আমরা পেতে দেবো না। না—না—না।

দু-দশ দিন কেটে গেলো। জিনির কাছে রোজই যাই আমরা। একদিন শুনলাম, জিনিকে বরফ সাহেবের ঘর ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেন, কোথায়, কি ব্যাপার—? জিনি

কিছুই জানে না। বরফকলের মালিকের হুকুম। অন্য সাহেব আসবে সে বাড়িতে। মুখ শুকনো জিনির। বললে, কি হবে বীরু, তিনু, পাঁচু—আমি কোথায় যাবো ?

তাই তো, মহা-দুশ্চিন্তায় পড়লাম আমরা। জিনি যাবে কোথায়, থাকবে কার কাছে, খাবে কি ? জিনিকে সাহস দিয়ে বললাম, ভয় কি, আমরা আছি।

তারপর তিন বন্ধুতে চুপিচুপি ফাঁকায় বসে গালে হাত দিয়ে কতো পরামর্শ, কতো চিন্তা। রাত্রে আমাদের ঘুম বন্ধ। বীরু বললে, তার বাবা লোক ভালো, কিন্তু মা—মা খেস্টান মেয়ে বাড়িতে রাখতে রাজি নয়। তিনু বীরুর কথা শুনে বললে, তার মা বড় ভালো, কিন্তু ঠাকুমা ! বুড়ি একেবারে হাড়-জ্বালানো ছুঁচিবাই। জিনিকে ঘরের চৌকাঠ মাড়াতে দেবে না। আমি বললুম, জিনি সরস্বতী পূজোতে অঞ্জলি দেয়, মা কালীকে প্রণাম করে ; ও খেস্টান নয়। তিনু বললে, তা হোক, ও খেস্টানই। গলায় যীশু আছে।

গলায় যীশু-ঝোলানো মেয়েকে আমিই বা ঘরে এনে তুলি কি করে, বাবা-মা আমারও আছে ; অতএব বীরু, তিনু যা পারে না, আমিও পারি না। অথচ এই না-পারাটা তখন আমাদের কাছে অত্যন্ত মর্মান্তিক দুঃখ নিয়ে দেখা দিয়েছে। কতো ভেবেছি আমরা তিন বন্ধু আমবাগানের ছায়ায় বসে, রাগ করেছি গুরুজনদের ওপর, মন তিক্ত হয়েছে যীশুর ওপর—যেন ওই গলার ক্রসটাই সমস্ত বাধা। আর নিজেদের অসহায়তার কথা তুলে সান্ত্বনা দিয়েছি পরস্পরকে।

আশ্চর্য, ওই বয়সেও আমাদের লজ্জা পাবার মত মন ছিলো। জিনির জন্যে কিছুই করতে পারছি না তারই লজ্জা। পরম লজ্জাই বলা যায়। জিনির কাছে যাওয়া বন্ধ করতে হলো। কাঁহাতক আর রোজ রোজ মিথ্যে কথা বলে তাকে ঠেকিয়ে রাখি। তা ছাড়া, সত্যি কথা বলতেও যেমন মুখ ফুটতো না, জিনির কাছে মিথ্যে কথা বলতেও তেমনি কষ্ট হতো।

জিনি বিহনে আমাদের কিশোর-বৃন্দাবন অন্ধকার। মন খারাপ, মেজাজ খারাপ—এমন কি, বোধ হয় শরীরটাও সকলের একটু খারাপ হয়ে গেলো।

সেদিন শনিবার। স্কুল থেকে ফিরে এসে বীরু আর আমি ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা চড়াচ্ছি, এমন সময় লাফাতে লাফাতে তিনু ছুটে এলো। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'জিনি—জিনি ডাকছে তোদের ; শীগ্রি চ'—।'

জিনি ? কোথায় জিনি ? মাঞ্জা মাথায় থাকলো—ছুটলাম আমরা জিনি সন্দর্শনে।

পাড়ার শেষে মাঠের কাছে ল্যাঙড়া ডাক্তারের বাড়িতে দেখা পেলাম জিনির ; কুলতলায় দাঁড়িয়ে ছিলো আমাদের অপেক্ষায়। দেখা হতে জিনি অভিমানভরে কাঁদলো, বললো তার মনোব্যথা করুণ সুরে।

বরফ সাহেবের বাড়িতে জিনির যে আয়াটা ছিল, সেই আয়া বুড়িই শেষ পর্যন্ত জিনিকে এখানে এনে ঠাঁই দিয়েছে। আমরা বললাম, তোমার ঘর কই ? জিনি জবাব দিলে, তার ঘর নেই। আয়া বুড়ির সাথে এক সঙ্গে একটা কুঠুরিতে সে থাকে।

জিনি আরও কতো কথা বললে, সমস্ত কথাই এ বাড়ির। এখানে তার কতো যে কষ্ট, তারই কথা। আমরা চুপ করে শুনলাম শুধু। বলার কিছু ছিলো না।

আসার সময় বীরু বললে, মন-টন খারাপ করো না, জিনি। আমাদের পাড়ার মধ্যে এসে গেছো, বেশ হয়েছে; এক পাড়াতেই কাছাকাছি থাকবো। রোজ আসবো আমরা।

বীরুর সান্ত্বনাটা যে নেহাতই অসার, একথা বুঝতে বেশ কিছুদিন লাগলো। জিনিকে আমাদের পাড়ার মধ্যে পেয়ে প্রথমটায় অবশ্য পুলকিত হয়েছিলাম, দুর্ভাবনা দূর হয়েছিলো জিনি আশ্রয় পেয়েছে জেনে। কিন্তু প্রথমে যা ভাবি নি, দেখি নি, ক্রমেই তা চোখে পড়তে লাগলো।

জিনি যে বাড়িতে এসে উঠেছিলো, সেটা এক পার্শী বুড়োর পাউরুটি-বিস্কুট-কেক তৈরির কারখানা। পার্শীটার নাম ছিলো পেস্‌রানজী, আমরা বলতুম পেস্তাবাদামজী। বাড়ির এক অংশে থাকতো সেই পেস্তাবাদামজীর পরিবার—সাহেবী কায়দায়; আলাদা করে ঘেরা সে অংশ। বাকি বাড়িটা ছিল পাঁউরুটির কারখানা—যেমনি নোঙরা, তেমনি গন্ধ। ওখানেই রুটি-বিস্কুট-কেক তৈরি হয়, আর এদিক-ওদিক মাথা গুঁজে পড়ে থাকে কারিগররা—যতো সব খানসামা, বাবুর্চি ক্লাসের ছোট-লোকের দল। ওরা বিড়ি ফোঁকে, ইতর ভাষায় কথা বলে, রগড় করে জিনিকে নিয়ে, আমরা গেলে আমাদের নিয়েও।

কাণ্ড-কারখানা যতো দেখি, ততো চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে। প্রথম-প্রথম দেখতাম, জিনির কোনো কাজ ছিলো না। বাড়ির

কোনো নির্জন কোণে এসে সে একা-একা বই পড়ছে, কি তেঁতুল-বিচি নিয়ে খেলছে। বাড়িতে স্থান না জুটলে কুল-তলায় ঠায় বসে থাকতো জিনি একা-একা। চলে আসতো আমাদের কাছে। ক্রমেই সেসব বন্ধ হলো। জিনি, দেখলাম, কাজকর্ম করে। কখন দেখি, জিনি দু হাতে বড় বালতি ধরে টেনে-হেঁচড়ে জল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কখন মাথায় তার পাঁউরুটির ঝুড়ি, কখন বা তোয়ালে-জড়ানো খাবার বয়ে দুপুর রোদে জিনি চলেছে পেস্তাবাদামজীর দোকানে—সেই পোস্ট অফিসের কাছে।

চোখের সামনে দেখি, জিনি দিন-দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে। তার ঠোঁটের হাসি মুছলো, মুছলো তার গালের লাল আভা। আটার গুঁড়োয় অমন চুল তার রুক্ষ লালচে হয়ে উঠেছে। জিনির গায়ে ছেঁড়া ফ্রক ; পায়ে রঙ-করা মুসলমানী মেয়েদের মত খড়ম।

জিনিকে একদিন বললাম, 'তুমি এতো কাজ করো কেন ?'

জিনি করুণ সুরে জবাব দিলো, 'কাজ না করলে মারে, খেতে দেয় না।'

জিনির কথা শুনে বীরু লাফিয়ে উঠলো, 'কে মারে তোমায়—নাম বলো। সে ব্যাটার আমি হাত ভাঙবো।'

জিনি জবাব দিলো, 'কার নাম বলবো, সকলেই। কাজ করতে না পারলে মারবে ছাড়া আর কি করবে !'

আমাদের সেই আয়াবুড়ির কাছে গেলাম। সে বুড়ি কেঁদে-কেটে বললে, 'খোকাবাবুরা, আমার নসিব। আঁখ্ গেছে আমার—দেখতে পাই না এক চোখে, পার্শী সাহেবের বাড়িতে

ফাই-ফরমাস খাটি। সাত টাকা তলব দেয়। জিনিমিসি কারখানায় খাটে—পাঁচ টাকা তলব। না খাটলে দানা পড়বে না পেটে। তব্ভি জিনিমিসিকে আমি এক আঁখে রাখি। নয়তো এরা ওকে কুত্তার মত ছিঁড়ে খেতো। জিনিমিসির উমর বাড়লো।'

সত্যিই, জিনির বয়স বেড়েছে ; বয়স বেড়েছে আমাদেরও। এখন অনেক জিনিস বুঝি, অনেক জিনিস দেখি। ময়লা, রঙিন শাড়ি পরে, কোমর পর্যন্ত রুক্ষ চুলের এক বেণী ঝুলিয়ে জিনি যখন আমাদের কাছে এসে দাঁড়ায়, আমরা তখন তার বাড়ন্ত দেহটাকে আড় চোখে লক্ষ করে জিনির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে উঠি।

আমরা কারখানায় জিনির কাছে গেলে ইদ্রিস, নুলো—সব ক'টা লোকই ইতর রসিকতা করে, হাসে কুৎসিতভাবে। সম্মানে আঘাত লাগে আমাদের। বীরু বলে, এ বাড়িতে জিনি থাকে থাকুক, আমাদের আসা চলবে না। তিনু মাথা নেড়ে সায় দিলে। আমিও মাথা নাড়লুম।

জিনির সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধনটা আরও ক্ষীণ হলো। আমরা বেশ বুঝতে পেরেছিলাম, বরফ সাহেবের বাড়িতে যে জিনি আমাদের স্বপ্ন ছিলো, যাকে মনে মনে অনেক উঁচুতে স্থান দিয়েছিলাম—সেই জিনি পেসরানজীর পাঁউরুটি কারখানায় ছোটলোকদের ভিড়ে একসাথে থেকে, খেয়ে, চুল্লি ধরিয়ে, আঠা মেখে অনেক নীচুতে নেমে গেছে। আমাদের সাথে ওর মেলামেশা প্রকাশ্যভাবে আর চলে না। সেটা দৃষ্টিকটু।

দিনে দিনে যাওয়া-আসা, দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হলো। নেহাতই যদি কোনদিন পথে দেখা হতো, কিংবা জিনি আসতো গল্পের বই চাইতে, তবেই কথা হতো। তাও যৎসামান্য দু-চারটে কথা।

জিনিকে আমরা এড়িয়ে চলি প্রত্যক্ষভাবে, কিন্তু পরোক্ষ-ভাবে তার নামে কথা উঠলেই কান খাড়া করে শুনি। হ্যাঁ—তখন ক্রমাগতই জিনির নামে কুৎসা শুনছি, নানান মুখে।

একদিন তিনু এসে বললে, 'এ শালা জাতের দোষ—।'

—কিসের? প্রশ্ন করলুম অবাক হয়ে।

—জাতের; বুঝলি না, হাঁদারাম। যার জন্মের ঠিক নেই, দো-আঁশলা—সে ছুঁড়ির আর হবে কি? যাই বলো, ও ঠিক ওর মনের মত জায়গায় জমে গেছে।

—কার কথা বলছিস্ রে, জিনির কথা?—বীরু লাল ঘুঁটিটা পকেটে ফেলে ক্যারাম বোর্ডটা ঠেলে সরিয়ে দিলো।

—আজ্ঞে হ্যাঁ—জিনি নয় তো কার! আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, মাইরি—ও কিছুতেই সাহেব-টাহেব নয়, একেবারে লেড়িকুত্তার জাত। ময়ূরপুচ্ছ গুঁজে বসেছিলো। এখন সব পুচ্ছ খসে গেছে।

তিনুর উত্তেজিত হবার কারণটা জানা গেলো। কাল শেষ-বিকেলে নাকি কোন ধানক্ষেতের ধারে জিনি আর ইদ্রিসকে দেখা গেছে—বিজন বলেছে তাকে।

খবরটা জানিয়ে তিনু নানারকম খারাপ মন্তব্য করতে লাগলো।

—যা মুখে আসে, তাই যে বলছিস, তিনু। বললাম আমি অসন্তুষ্ট হয়ে।

—কি খারাপ বলেছে? বীরু তিনুর হয়ে জবাব দিলো।

—জিনি ভালোই হোক আর মন্দই হোক, তোর আমার কি? বললুম আমি।

—কেন নয়? বীরু দপ্ করে জ্বলে উঠলো যেনো, 'জিনি কি ইদ্রিসের?'

—তো কি তোর নাকি? আমার মুখে দিয়ে ফস্ করে কথাটা বেরিয়ে গেলো।

—আলবাৎ। আমাদের নয় তো কোন শালার?

আমি চুপ এবং আমরাও।

জিনি কি আমাদের? আমি ভাবলুম। শুধুই কি আমি ভেবেছি? না, না—বীরু, তিনু, আমি—আমরা সবাই হয়তো সেদিন ভেবেছি—জিনি কি আমাদের?

মাস, বছর কেটে গেলো চোখের ওপর দিয়ে। আমরা তখন ম্যাট্রিক পাস করে বেকার বসে আছি। তিনজনেই চেষ্টায় আছি রেলের চাকরির। মাঝে মাঝে ইন্টারভ্যু দিয়ে আসি আসানসোল গিয়ে। ওই পর্যন্ত, চাকরি আর কপালে জোটে না।

বেকার যুবকদের কাজ কি কি হতে পারে—তোমরাই ভেবে নাও। স্রেফ তোটেল-ডি পাপার অন্ন ধ্বংস, ঘুম, আড্ডা, বিড়ি ফোঁকা। আমরাও তার জের টেনে চলেছি। তফাতটুকু শুধু এই যে, আমরা অধিকন্তু তিনটি কাজ করতাম। রেল ইন্স্টিটিউট থেকে রাতারাতি অখাদ্য উপন্যাস এনে রাতারাতি

শেষ করা, খেলা থাকলে মাঠে ছোটা. আর—আর বুঝতেই তো পারছো, যেহেতু বয়সটা খারাপ এবং হাতে অনন্ত সময়, সেহেতু নিজেদের মধ্য পাড়া-বেপাড়ার মেয়ে নিয়ে একটু খোস গল্প।

ফেরতা দিয়ে কাপড় পরে, গলার ওপর শার্টের কলার তুলে, বাঁ হাতে সাইকেল চালিয়ে বাঁশি বাজিয়ে বেশ মসৃণ গতিতে দিন কাটাচ্ছি, হঠাৎ জিনি সব সুখ ভেস্তে দিলে।

পার্শী পেসরানজীর বেকারি উঠে গেছে, জিনি কাজ নিয়েছে ধানবাদ রেল ইনস্টিটিউটের সিনেমাতে—লেডিস গেটের গেট-কিপার। নীল শাড়ি পরে, বিনুনি দুলিয়ে, শ্লিপারে ধুলো উড়িয়ে জিনি আমাদের চোখের ওপর দিয়ে চাকরি করতে যায়। তখনও সে থাকে আমাদের পাড়াতেই—একটা ঘর ভাড়া করে।

সে কথা যাক্, আসল কথা বলি। এই বয়সে জিনিকে আবার যেনো হঠাৎ একদিন নতুন চোখে দেখলাম।

সিনেমা দেখতে গিয়েছিলুম আমরা—বীরু, তিনু আর আমি। টিকিট পেলাম না। কি একটা বাঙলা বই হচ্ছিলো, বেজায় ভিড়। রাত্রের শোয়ের টিকিট কিনে সামনের চায়ের স্টলে বসে বসে গল্প করছি আর চা খাচ্ছি মৌজ করে. সেই সঙ্গে এদিক-ওদিক চোখ রেখে সিগারেট ফুঁকছি। এমন সময় দেখি, কলকাতা থেকে নতুন আমদানি চালিয়াত সিনেমা অপারেটার সুখেন্দু ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে হি-হি করে হাসতে হাসতে স্টলে ঢুকছে—পাশে তার জিনি। আমাদের দেখে জিনি হাসি-মুখেই কি একটা বললো যেনো, তারপর ওরা দু'জনেই পর্দা-ফেলা ঢাকা জায়গার মধ্যে গিয়ে বসলো।

বীরু তাকালো আমার দিকে, আমি তিন্নুর দিকে। তিনজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে সবাই একসঙ্গে তাকালুম পর্দার দিকে। সব লক্ষ করলাম আমরা। চপ্ গেলো, কেক্ গেলো, টি-পটে করে চা গেলো পর্দার ভেতরে। সুখেন্দুর হাসির সাথে মাঝে মাঝে জিনির হাসিও কানে এলো। সিগারেটের গন্ধও ভেসে আসতে লাগলো পর্দার ভেতর থেকে।

সেদিন যে মাথা-মুণ্ডু কি ছবি দেখেছি, জানি না। শোয়ের শেষে তিন বন্ধুই গুম হয়ে অন্ধকারে পথ হেঁটেছি। পাড়ার কাছাকাছি এসে বীরু বললো, 'জিনি তা হলে বেশ ভালোই আছে!' তিন্নু বললে, 'বেকারিতে থাকার সময় শুঁটকি মেরে গিয়েছিলো। দেখলে মনে হতো, টি বি রুগী। এখন চেহারাটা বেশ ফিরেছে।' আমি বললুম, 'সুখেন্দু লুটছে।' আমার কথা শুনে বীরু উত্তেজিত হয়ে ঘোষণা করলে, 'লুটোচ্ছি। ওসব কলকাতিয়াগিরি ধানবাদে চলবে না।'

মিথ্যে কথা বলবো না। সেইদিন থেকে কি যেন হয়ে গেলো আমাদের। সে অবস্থা বর্ণনা করা মুশকিল। এক কথায় বলতে পারি, বিশ্রী একটা ঈর্ষায় আমরা জ্বলতে লাগলুম মনে মনে। এ ঈর্ষা কেন, কার ওপর, তা কি খতিয়ে দেখেছি নাকি? উঁহু, সেসব দেখি নি। খালি ভেবেছি, এ আমাদের হার। একেবারে থ্রি টু নীলে। ক্যালকেশিয়ান সুখেন্দু আমাদের হারিয়ে দিয়েছে।

পাড়ায় ঘাঁটি ফেললাম—ঘাঁটি ফেললাম সিনেমায়। জিনির যাওয়া-আসা চাল-চলনে নজর রাখি। কখন যায়, কখন ফেরে, কি করে।

একদিন তিনু এসে বলে, সুখেন্দু আর জিনি অপারেটারের ঘরে গা জড়াজড়ি করে বসে থাকে। বীরু বলে, সুখেন্দু জিনিকে ওই ফুল-তোলা শাড়িটা কিনে দিয়েছে। আমি বলি, জিনি আজকাল রোজ বেশ রাত করে ফেরে।

অসহ্য—অসহ্য! এ আমাদের অসহ্য। মনে পড়ে বীরুর কথা—আলবাৎ জিনি আমাদের। আমাদের নয় তো কার? সেই জিনি বেলেল্লাপনা শুরু করেছে; আর আমরা শুধু দেখেই যাবো!

বীরু সুখেন্দুকে একটা উড়ো চিঠি দিয়ে শাসালো। কোন কাজ হলো না। আড্ডায় তিনজনেই আমরা লোভনীয় তিনটি প্রত্যক্ষ দৃশ্য দেখেছি বলে বর্ণনা দিলুম। সত্যি বলতে কি, আমি কিছুই দেখি নি। কিন্তু বীরু, তিনু যদি দেখে থাকে, আমার না দেখাটা শোভা পায় না। বানিয়েই বললুম, সুখেন্দু আর জিনি রাত প্রায় বারোটার সময় কাল পাড়ায় এসেছে। সুখেন্দু জিনির ঘরেই ছিলো। সারা রাত।

শুনে বীরু আমাদের টেনে নিয়ে সটান গিয়ে হাজির হলো জিনির কাছে।

—কি? জিনি প্রশ্ন করলে।

—এটা ভদ্রলোকের পাড়া, জিনি।

—ওমা, তা কে না জানে? জিনি হেসে ফেললো।

—জানো তো, এমন হয় কেন? বীরু অনেক কষ্টে বললে।

—কি? জিনি জানতে চাইলো।

বীরু আমায় বলতে বললে 'কি'-টা। আমি কি বলবো! আমি বলতে বললাম তিন্নুকে। তিন্নু বললে বীরুকে।

শেষ পর্যন্ত কিছুই বলা হলো না। আমরা বোকার মত তিনজনে ফিরলাম। জিনি খিলখিল করে হাসতে লাগলো।

জিনির হাসি যেন আমাদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিলে। জ্বলে-পুড়ে মরতে লাগলুম তিন বন্ধু। এ অপমান বরদাস্ত করা যায় না।

এমন সময় হঠাৎ একদিন হকি খেলে ফেরার পথে সুখেন্দুকে পেয়ে গেলুম ফাঁকায়। বীরু তাকে গিয়ে ধরলো, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও।

হকি-স্টিকের মার তো কম নয়। সুখেন্দু বেশ ক'দিন বিছানায় পড়ে থাকলো।

তারপর আবার যে কে সেই। সুখেন্দু আর জিনি। একটা শুধু পরিবর্তন লক্ষ করলাম। জিনি আজকাল আমাদের দেখেও দেখে না। পথে দেখা হলে মুখ নীচু করে দ্রুত পায়ে পাশ কাটিয়ে যায়।

এও অসহ্য। বীরু বললে, 'ওর লভারকে ঠেঙিয়েছো, ও তোমাদের দিকে তাকাবে কেন? মনে মনে খাপ্পা হয়ে গেছে।'

তিন্নু বললে 'তাই বলে এ অপমান!'

তিন বন্ধু যুক্তি আঁটলাম নানারকম এবং সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক যেটা, সেটাই প্রয়োগ করলাম এবার। প্রতিশোধ নেবার এমন দুর্দমনীয় বাসনা মানুষের কেন হয়, কে জানে!

সিনেমা সেক্রেটারি মানিক অধিকারীকে এক চিঠি

পাঠালাম। আমাদের রেল-পাড়ার কয়েকজন বাপের বয়সী ভদ্রলোকের নাম-সই জাল করে, ব্লক নম্বর দিয়ে। তাতে জিনির চরিত্র সম্পর্কে লোমহর্ষক কুৎসিত ইঙ্গিত নানারকমের। ও মেয়েকে চাকরিতে রাখলে বাড়ির বৌ-ঝিকে আর সিনেমা দেখতে পাঠানো যাবে না। যদি জিনির চাকরি এর পরও থাকে, তবে জেনারেল মিটিংএ এইসব নিয়ে কেলেঙ্কারি হবে কিন্তু।

মফস্বল শহরের রেল ইনস্টিটিউটের সিনেমা সেক্রেটারি—তাঁর অতো ঝামেলায় কাজ কি। জিনির চাকরি গেল। এমন কি, কয়েকদিন বাদে সুখেন্দুরও।

আমরা খুব খুশী। যেন যুদ্ধ জয় করেছি। আনন্দের চোটে একদিন ভিজে বেড়ালের মত জিনির বাড়িতে সহানুভূতি জানাতে গেলাম। জিনি সেদিন আমাদের পরম বিস্ময়-ভরা চোখ নিয়ে অনেকক্ষণ দেখেছিলো, একটাও কথা বলে নি।

গল্পটা এখানে শেষ হতে পারতো, যদি জিনি সুখেন্দুর সাথে ধানবাদ ছেড়ে চলে যেতো। আমরা তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু জিনি আমাদের অনুমান মিথ্যে করলো। সুখেন্দু ধানবাদ ছেড়ে চলে গেল, আর জিনি আমাদের পাড়া ছেড়ে বাজারের মধ্যে খোলার চালওয়ালা এক সরু নোংরা গলিতে গিয়ে ঘর বাঁধলো। একা।

জিনি যেখানে ঘর বাঁধলো, সে গলিটা সম্পর্কে নানান জনে নানা কথা বলতো। ওখানে বাজারের শাকসব্জি, আলু-পটল-

ওয়ালারা থাকে, থাকে মুটে-মজুর-ঝিয়ের দল এবং আরও এ-ও, যাদের দু'চার টাকায় মাথা গোঁজার জায়গা চাই, তারাই।

বাজারের মধ্যে দিয়ে ইনস্টিটিউট যাবার ওইটেই ছিলো শর্ট-কাট পথ। আমরা সাইকেল নিয়েও ওই পথ দিয়ে যাতায়াত করতুম। জিনি যাওয়ার পর ওই পথে যাতায়াতটাও আমাদের বেড়ে গেল।

একদিন এক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলুম। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। ইনস্টিটিউট থেকে আমরা দুই বন্ধু—বীরু আর আমি ব্রিজ টুর্নামেন্ট খেলে ফিরছি ভিজতে ভিজতে, জিনিদের অন্ধকার গলির পথ দিয়ে। হঠাৎ চেপে বৃষ্টি এলো। একটা ঘোড়ার গাড়ির আস্তাবলের টিনের চালার তলায় দাঁড়ালুম আমরা।

এক সময় বীরু হঠাৎ বললে, 'এই ছাখ্—ছাখ'—

বীরুর নির্দেশ অনুসরণ করে আমি তাকালুম। মিউনিসিপ্যালিটির মিটমিটে লাইট-পোস্টের কাছে একটা লোক ঘুরঘুর করছে। টলটল পা। দু-চার পা এদিক-ওদিকে যাওয়া-আসা করতে করতে শেষ পর্যন্ত একটা ঘরের দরজায় বসে পড়লো।

—নন্দ না?

—হ্যাঁ, নন্দ বলেই মনে হচ্ছে। আমি বললুম।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে বীরু বেশ একটু কঠিন গলায় বললে, 'নন্দও আজকাল জিনির কাছে আসে!

—জিনি? আমি অবাক, 'তুই জানলি কি করে?'

—জানি। ও বাড়িটা জিনির।

বৃষ্টি থেমে এলো; আমরাও পথে নামলাম।

পরের দিন জিনির প্রসঙ্গ উঠলো। উঠবেই যে, সেটা স্বাভাবিক। তিনু সব শুনে টিপ্পনী কাটলো, 'মাত্র এ্যই—এ আমি আগেই জানতাম। কি না দেখেছি, আর না শুনেছি। রীতিমত একটা বেশ্যা হয়ে উঠেছে জিনি। বাজারের যতো মদো-মাতাল আলুওয়ালা-বিড়িওয়ালা ওর কাছে যায়-আসে।'

তিনুর কথা শুনে বীরু দপ্ করে জ্বলে উঠলো।

—যাওয়াচ্ছি সব শালাকে। দাঁড়া—

—কি করবি তুই? আমি প্রশ্ন করলুম।

—পেঁদিয়ে বাজার থেকে তাড়াবো। এ কি মুফতি মাল নাকি? যে আসবে, সেই। বীরু উত্তেজনায় মাথায় বিড়ির টুকরোটা ছুঁড়ে দিলো তিনুর গায়েই। তিনু ক্ষিপ্র হাতে জামা বাঁচিয়ে বিড়ির শেষ অংশটুকু ফুঁকতে লাগলো চোখ ছোট করে।

—শেষ পর্যন্ত আলুওয়ালা নন্দ! শেম! বীরু কপালে হাত তুললো।

—কী অধঃপতন! তিনু চোখ ছোট ছোট করেই যোগ করলে, 'বরফ সাহেবের মেয়ে আলুওয়ালা নন্দর—'

তিনুর বাকি কথাটা শেষ করতে না দিয়ে আমি বললুম, 'আচ্ছা বীরু, আমাদের এতো মাথাব্যথার দরকার কি? যার ছাগল, সে যেখানে খুশি কাটুক।'

বীরু কটমট করে আমার দিকে তাকালো। এবং পরমুহূর্তেই অধৈর্য হয়ে চীৎকার করে উঠলো, 'পাঁঠাটা কি নন্দর?'

—আমাদেরও না। আমি বললুম।

—আলবাৎ আমাদের। আমাদের নয় তো কোন ব্যাটার।

আস্ক্ তিন্নু. এ একটা মরাল রেস্পন্সিবিলিটির কোশ্চেন : হাজার হোক, জিনি আমাদের ছেলেবেলার বন্ধু— বরফ সাহেবের মেয়ে। একসঙ্গে, এক পাড়ায় আমরা থেকেছি। সেই মেয়েটা বাজারের বনে যাবে, ছাট্‌স্ ইম্পস্ব্ল ! উই ক্যান্ট এ্যালাও ছাট্।

—ঠিক বলেছে বীরু। তিন্নু আমার দিকে তাকিয়ে বললে. 'তুই ভাব পাঁচু, ছেলেবেলার সেই জিনি আর আজকের জিনি। এ একেবারে তোর সেই হেভেন্ এণ্ড হেল্। বরফ সাহেব কাণ্ডকারখানা দেখে স্বর্গ থেকে আমাদের মুণ্ডুপাত করছে।'

—শোনো! বীরু আমার দিকে তর্জনী তুলে শাসালো, যেন আমিই জিনি। বললে, 'আমার বাবা প্লেন্ কথা। তুমি আমাদের বন্ধুলোক, গরীব হও, বড়লোক হও, যায় আসে না; বাট্ ইউ মাস্ট্ বি গুড্। এসব বেলেল্লাগিরি চলবে না। জিনিকে শেষবারের মত এই কথাটা জানিয়ে দেবো।'

বীরু আর তিন্নু যা বললে, তাতে আর আমার সন্দেহ রইলো না, জিনিকে সৎপথে রাখাটা আমাদের নৈতিক কর্তব্য অর্থাৎ মরাল রেস্পন্সিবিলিটি।

এর পর কয়েক দিন বীরু, তিন্নু আর আমি বাজারপাড়ার সেই গলির মধ্যে ঘুরঘুর করলাম একসঙ্গেই। বাড়ির বাজারটা আমরা স্বহস্তে করতাম। বেকার অবস্থায় ইন্কামের ওই একটা পথ গার্জেনরা আমাদের দয়া করে দিয়ে থাকেন। আলুওয়ালা নন্দর কাছে, আলুটা আমরা কিনতাম বরাবরই। তার প্রধান কারণ, নন্দ আমাদের কাছে ধার রাখতো। আর

দ্বিতীয় কারণ, ভদ্রলোকের ছেলে সে; ইউ পি স্কুলের শেষ ক্লাস পর্যন্ত আমাদের সাথে পড়েছিলো, সেই সুবাদে বাল্যবন্ধু। অবশ্য বাল্যকালটা যেমন চিরন্তন নয়, তেমনি নন্দর‌ও সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্কটাও সেই ফাইভ ক্লাসেই শেষ হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে নন্দ তার তরফ থেকে বন্ধুত্বটুকু রাখতে চেয়েছিলো, আমরা পাত্তা দিই নি। ইদানীং ধার পাই বলে হেসে-টেসে দু-চারটে কথা বলি। যাই হোক, বাজার করতে গিয়ে আমরা আভাসে নন্দকে ঠেস দিয়ে কথা বলেছি, পরখ করতে চেয়েছি তার মনোভাব। মোটা-মাথা, নাদুস-নুদুস নন্দ পানের ছোপ্-ধরা দাঁত বের করে শুধু হেসেছে। কিছুই বোঝে নি, কিছুই বলে নি।

বীরু বললে, ও বেটা পয়লা নম্বরের শয়তান। তিনু বললে. তা না হলে আলুর ব্যবসা করে টু পাইস্ করে। আমি বললুম, ওর মাথা মোটা নয় মাইরি, বেড়ে চালাক দেখছি।

ইতিমধ্যে এক সুযোগ এলো আমাদের হাতে। একেবারেই আকস্মিকভাবে।

রাত তখন গোটা দশেক হবে বোধ হয়। বর্ষার দিন। বৃষ্টি আসে হঠাৎ, থামে খানিকক্ষণ; তারপর আবার দেখো, সেই একঘেয়ে ইলশেগুঁড়ি। বীরু, তিনু আর আমি সেদিন এক-সঙ্গে রাত করেই ইনস্টিটিউট থেকে ফিরছি বাজারপাড়ার গলি দিয়ে। গলি ফাঁকা। মিউনিসিপ্যালিটির সেই বাতিটা টিম-টিম করে জ্বলছে। গলি প্রায় ফুরিয়ে আসে-আসে এমন সময় দেখি—নন্দ। অন্ধকারের কোন সঙ্গোপন কোণ থেকে টলতে

টলতে বেরিয়ে আমাদের প্রায় ঘাড়ের ওপর পড়ে আর কি।

আমরা একটু সরে গেলাম। নন্দও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলতে লাগলো পা ফাঁক করে। তারপর দু হাত জোড় করে মদের ঝোঁকে সে যেন জড়িয়ে জড়িয়ে কি একটা বলবার চেষ্টা করলে। বোধ হয় ঘাড়ের ওপর এসে পড়ার জন্যে ক্ষমা চাইছিলো।

বীরু তাকালো তিনুর দিকে, তিনু আমার দিকে। তিনু ইতর একটা উক্তি করলো নন্দকে উপলক্ষ করে। তিনজনে সেই উক্তির সূত্র ধরে আর একবার চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। আমাদের চোখে যে কি ছিলো, জানি না। বীরু হঠাৎ দু পা এগিয়ে নন্দর মুখে ধড়াম করে এক ঘুঁষি বসিয়ে দিলে। আচমকা ঘুঁষি খেয়ে মাতাল নন্দ টলতে টলতে রাস্তার ওপর প্রায় পড়-পড়—দেখি, তিনু ছুটে গিয়ে তার পেটে টেনে এক লাথি মারলো। কেমন একটা আঁতকে ওঠার শব্দ করে নন্দ রাস্তার ওপর মুখ গুঁজে পড়লো।

—ঠিক হয়েছে। শালা, মাতাল। দাঁতে দাঁত চেপে বললে তিনু, 'চল, পালাই।'

—চল্। বীরু জামায় হাত ঘষতে ঘষতে পিছু ফিরলে।

—বীরু। আমি ডাকলুম।

বীরু, তিনু ফিরে দাঁড়ালো।

নীচু গলায় বললাম আমি, 'কেটে তো পড়ছি। কিন্তু নন্দটা কেমন করে গোঙাচ্ছে দেখ্। ব্যাটা যদি মরেই যায়।'

—মরে মরুক, চলে আয়। তিনু জবাব দিলে।

বীরু নন্দর ভূলুণ্ঠিত দেহের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি ভেবে তার পাশেই বসে পড়লো। একটু পরে উঠে দাঁড়িয়ে নীচু গলাতেই বললে, 'মারটা বড় জোর হয়ে গেছে রে, পাঁচু! শালার নাক-মুখ দিয়ে এখনও রক্ত পড়ছে। মাইরি। এভাবে সারা রাত পড়ে থাকলে ব্যাটা মরুক না মরুক, নির্ঘাত নিমোনিয়া হয়ে যাবে।

বীরুর কথায় ভীত হলাম। বললাম, 'কি করবি? ফেলে পালাবি?'

বীরু দাঁতে ঠোঁট কামড়ে কি যেনো ভাবছিলো। হঠাৎ বললে, 'অল্ রাইট্। ধর শালাকে, চ্যাংদোলা করে তোল্!'

আমরা তাকালুম। অর্থাৎ প্রশ্ন করলুম, চ্যাংদোলা করে না হয় তুললাম নন্দকে, কিন্তু তারপর—তারপর কি?

আমাদের মনোভাব বুঝে বীরু বললে, 'ঘাবড়াস না। সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি মাথায় এসেছে। নন্দকে জিনির জিম্মায় দিয়ে যাই। যার জিনিস সে বুঝুক। জিনিও জানুক, আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পীরিত করা যায় না।'

বীরুর প্রস্তাব আমাদের মনঃপূত হলো। ঠিক বলেছে বীরু।

নন্দর সেই বিশাল সিক্ত বপু আমরা কোনরকমে টানতে টানতে বয়ে চললাম। উৎকট গন্ধ ভাসছে নন্দর গা থেকে! কি যেন বিড়বিড় করছে হারামজাদাটা তখনও।

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর ভেতর থেকে জবাব এলো, 'কে?'

বীরু জবাব দিলো। বললে, 'আমরা—বীরু, তিনু, পাঁচু! বিপদ হয়েছে। শিগগির খোলো।'

দরজা খুললো জিনি, হাতে তার লণ্ঠন। কোন ভূমিকা না করেই নন্দর বেহুঁশ দেহটাকে আমরা রোয়াকে নামিয়ে রাখলুম।

লণ্ঠনের আলো নন্দর মুখে ফেলে জিনি আঁতকে আর্তনাদ করে বলে উঠলো, 'এ কি ? একে এখানে নিয়ে এসেছো কেন ?'

বীরু নন্দর কাপড়ের খুঁট দিয়ে তার নাক-মুখ মুছিয়ে দিয়ে বললে, 'মাতাল লোক, পথ চলতে পারে না, নালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছে। ভয় নেই, রক্ত বন্ধ হয়ে এসেছে—ঠিক হয়ে যাবে।'

—তা, তা তোমরা ওকে এখানে আনলে কেন ? জিনি ভীত, বিস্মিত গলায় আবার বললে।

—কোথায় তবে নিয়ে যাবো ? বীরুর গলার স্বরে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, 'ছেলেবেলার বন্ধু আমাদের নন্দ, আর তুমিও হলে ছেলেবেলার বান্ধবী। নন্দ নর্দমায় মুখ গুঁজে সারা রাত পড়ে থাকবে, তাই কি চোখে দেখতে পারি! পৌঁছে দিয়ে গেলাম তাই। আয় পাঁচু, তিনু—'

বীরুর ডাকের সাথে আমরা জিনির ঘরের দরজা টপকে রাস্তায় এসে নামলুম। দরজা হাট হয়েই খোলা থাকলো।

গলি পেরিয়ে আমরা যখন বড় রাস্তায় পা দিয়েছি—তিনু বললে, 'আ—এ যা একটা হলো না মাইরি, খাসা—সব অপমান স্রেফ জুড়িয়ে জল হয়ে গেলো।'

বীরু গম্ভীর স্বরেই জবাব দিলে, 'নোব্ল রিভেঞ্জ !'

এ ঘটনার কয়েকদিন পরের কথা। বরুদের বাড়িতে বসে আমরা তাস খেলছি। তখন দুপুর। হঠাৎ দেখি—নন্দ। নন্দকে ক'দিনই আর আলুর দোকানে দেখি নি।

ঘরে ঢুকেই নন্দ আমাদের পাশে বসে পড়ে তিনবার তিনজনের হাত জড়িয়ে ধরলো। কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম আমরা। নন্দটাও যে কি বলবে, ঠিক করতে পারছে না। পানের ছোপ-ধরা দাঁতগুলো বের করে হাসিতে, আহ্লাদে, মিনতিতে ঠিক একটা কুকুরছানার মত কেঁউ কেঁউ করতে লাগলো।

—কি ব্যাপার! বীরু জানতে চাইলো যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে।

নন্দ আরও একবার কেঁউ কেঁউ করে বীরুর হাত চেপে ধরলো।

—ভাই, আজ আমি তোমাদের কাছে এসেছি, একটা কথা আমার রাখতেই হবে।

আমরা সন্ত্রস্ত হলুম। নন্দ নিশ্চয় ধারের পাওনা টাকা চাইতে এসেছে। তিনজনে চোখাচোখি হয়ে গেলো।

—কি কথা? তিনু বললে।

যেন কেউ নন্দকে কাতুকুতু দিচ্ছে মুখ, চোখ, গলার তেমনি একটা কিম্ভূতকিমাকার আহ্লাদে মুখ করে নন্দ বললে, 'আমার বিয়ে ভাই আজ, তোমাদের যেতেই হবে। তোমরা না গেলে হবে না, কিছুতেই হবে না। তোমরা আমার বন্ধু, তোমাদের দয়াতেই তো পেয়ে গেলাম।'

নন্দর বিয়ে! আমরা বোবা, বোকা বনে গেলুম।

—কোথায় বিয়ে? বীরু প্রশ্ন করলে।

—কোথায় আবার, এখানেই। বাজার-গলিতে। তোমাদের ভাই যাওয়া চাইই। আমার অনুরোধ। নন্দ একটু থেমে বিগলিত হয়ে দাঁত বের করে হেসে বললো, 'আমার ভাবী বউয়েরও। সে তো বারবার করে বলে পাঠিয়েছে। তা ছাড়া, তোমরাই তো তাকে চেনো, আমার হাতে দিয়েছো, তোমরাই সাক্ষী হবে বিয়ের।'

—সাক্ষী হবো আমরা? বীরু লাফিয়ে উঠলো, 'কি বলছিস নন্দ—ও সমস্ত তোর ইলিরিলি কথা রাখ্—; সাফ-সোফ জবাব দে। কার সঙ্গে বিয়ে তোর, কিসের সাক্ষী?

—যাঃ! নন্দ মেয়েমানুষের মত মিনমিনে লাজুক গলায় বললে, 'কিছুই যেনো জানো না তোমরা। জিনিয়া ভাই—তোমাদের সেই জিনিয়ার সঙ্গে বিয়ে। সই-করা বিয়ে কিনা, বোঝোই তো, তোমরা ছাড়া কে আমাদের সাক্ষী হবে।'

নন্দ উঠলো। চট করে তার কোঁচার খুঁট গলায় জড়িয়ে হাত জোড় করলে আবার। বললে, 'গলায় কাপড় দিয়ে বলে যাচ্ছি ভাই, নিশ্চয় যেও। না এলে বড় দুঃখ পাবো। সন্ধ্যে-বেলায় একটু সকাল-সকাল আসা চাই। অনেক কাজ এখন আমার। চলি ভাই।'

নন্দ যেমন ঝড়ের মত এসেছিলো, তেমনি ঝড়ের মত চলে গেলো। আমরা—বীরু, তিনু আর আমি—আমরা সেই ঝড়ের ধাক্কায় যেনো সমূল বৃক্ষের মত ছিটকে পড়েছি।

অনেকক্ষণ পরে বীরু বললে, 'কি রে কি বুঝছিস ?'

—ভেড়া বনে গেলুম মাইরি, বুঝবো আবার কি ? দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জবাব দিলে তিনু।

—যাবি নাকি ? প্রশ্ন করলুম আমি।

বীরু ঘরের মধ্যে খানিকটা পায়চারি করলে, বিড়ির ধোঁয়ায় আরও ধোঁয়া করে তুললো আমাদের মন। অবশেষে কম্যাণ্ড করলো।

—আলবৎ যাবো। বেশ একটু আগেই যাবো। জিনিকে গিয়ে বোঝাবো, এখনো সময় আছে। আলুওয়ালা নন্দকে বিয়ে করা আর গলায় দড়ি দেওয়া সমান।

—বুঝিয়ে লাভ ? আমি মিয়ানো গলায় বললুম।

—লাভ আবার কি ! এটা আমাদের মরাল রেস্‌পন্‌-সিবিলিটি। কর্তব্য। বরফ সাহেবের মেয়ে জিনি, যার পায়ের নখের যুগ্যি নয় নন্দ, তাকে সে বিয়ে করবে ? কেন ? বিয়ে করার মত আর ছেলে নেই নাকি ? বীরু অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

—কিন্তু—তিনু আমতা আমতা করে বললে, 'জিনি যদি আমাদের কথা না শোনে ?'

—না শুনে যাবে কোথায় ? সাক্ষী—রেজেস্ট্রি ম্যারেজের সাক্ষী কারা ? আমরা তিনজনেই তো। তবে বাছাধন—হোয়ার টু গো ? বীরু চোখ টিপে ভুরু নাচালো, 'আজ সন্ধ্যায় গ্র্যাণ্ড একটা থিয়েটার হবে রে, পেঁচো। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি—নন্দ ব্যাটা হাতে-পায়ে ধরছে আমাদের, জিনি

হাউমাউ করে কাঁদছে'—বীরু সিনেমা-থিয়েটারের ভিলেন নায়কের মতই মুখ বেঁকিয়ে হেসে উঠলো।

মরাল রেস্‌পন্‌সিবিলিটি পালন করার মহান দায়িত্ব নিয়ে এবং মজা দেখবার অসীম আগ্রহ সাথে করে আমরা তিন বন্ধু বেশ সেজেগুজেই সন্ধ্যের গোড়াতেই বেরিয়ে পড়লাম।

জিনির বাড়ির কাছে পৌঁছে দেখি—দরজা বন্ধ। ভেতর থেকে জোর একটা আলোর রোশনাই উঁকি দিচ্ছে। কড়া নাড়বার জন্যে হাত বাড়াতেই দরজাটা খুলে গেলো। খোলাই ছিলো দরজা, ভেজানো ছিলো আর কি। মাথা বাড়িয়ে আমরা দেখলুম—উঠন ফাঁকা, বারান্দাটুকুও। ঘরের ভেতরে বাতি জ্বলছে।

গলা পরিষ্কার করে বীরু ডাকলো, 'নন্দ।'

ডাকের সাথে সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো জিনি। দরজার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললে, 'তোমরা এসে গেছো? দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এসো—ঘরে চলো।'

বারান্দায় জুতো খুলে রেখে আমরা ঘরে গিয়ে বসলাম। একটা তক্তাপোশের ওপর সতরঞ্চি আর নক্‌শা-কাটা সুজনি বীছিয়ে বসবার জায়গা করেছে নন্দ। জাপানী কাঁচের প্লেটে একরাশ বেলফুল। পাশেই একটা পানের ডিবে, সিগারেটের প্যাকেট। ঘরের এক কোণে টুলের ওপর পেট্রোম্যাক্স বাতিটা জ্বলছে নীলচে আভা ছড়িয়ে। ঘরটা আমরা নজর করলুম চোরা চোখে চেয়ে চেয়ে। নিরাভরণ ঘর। টুকিটাকি ক'টা

জিনিস। একটা শুধু ছবি দেখলাম দেওয়ালে। মনে হলো— বরফ সাহেবের ছবি।

ঘর ঢুকে জিনি বললে, 'তোমাদের জন্যে চায়ের জল চড়িয়ে এলুম। একটু চা খাও কেমন, সবে তো সন্ধ্যে।'

—নন্দ কই? বীরু প্রশ্ন করলে।

—হীরাপুরে গেছে। এখুনি আসবে। জিনি কেমনভাবে যেন হাসলো। সলাজ হাসিই বোধ হয়।

কথা যেনো আর এগোচ্ছে না। চুপচাপ। অস্বস্তি বোধ করছি সকলেই। জিনি বোধ হয় অবস্থা বুঝেই বললে, 'তোমরা বসো। চা-টা নিয়ে আসি।'

জিনি ঘর ছেড়ে চলে যেতেই আমি ফিসফিস করে বললুম, 'জিনিকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে, না?'

তিনু বললে, 'খাসা দেখাচ্ছে।'

শুধু বীরু কিছু বললে না।

সত্যিই জিনিকে আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছিলো। অমন ধবধবে রঙ যার, অমন যার মুখচোখ দেহের বাঁধুনি, তাকে টকটকে লাল শাড়ি-ব্লাউজে পেট্রোম্যাক্সের উজ্জ্বল নীলচে আলোয় যে ভালো লাগবে দেখতে, এ আর নতুন কথা কি। জিনি আজ খোঁপাও বেঁধেছে দেখলুম, খোঁপায় গুঁজেছে দুটি বেলের কুঁড়ি। এই প্রথম দেখলুম, বিনুনি ছেড়ে জিনি খোঁপা বাঁধলো।

মুগ্ধ গলায় বললাম আমি, 'নন্দর ভাগ্যটা ভালো।' কথাটা বীরুর কানে গেলো। বীরু তাকালো আমার দিকে উগ্র দৃষ্টিতে ফিসফিস করেই বললে, 'দেখা যাক্ ভাগ্যটা'—একটু থেমে

আবার—'জিনি চা নিয়ে এলে কথাটা আমি তুলবো, তোরা যোগান দিবি। হুঁশিয়ার। বাজে কথাটি কেউ বলবে না। গ্রেভ্ হতে হবে।'

জিনি আমাদের হাতে একে একে চায়ের পেয়ালা তুলে দিয়ে সরে দাঁড়ালো।

আমি, তিনু চায়ের কাপে ঠোঁট ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছি—এইবার বীরু শুরু করবে।

বীরু আর শুরু করে না। চায়ের কাপ শেষ হলো। আমরা আড়চোখে বীরুকে দেখছি। শেষ পর্যন্ত বীরু কি নার্ভাস হয়ে পড়লো!

জিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলে যাবার উপক্রম করছে, বীরু হঠাৎ কথা বললে, 'তুমি দাঁড়িয়ো রয়েছো কেন, বসো না? এখানেই বসো।' বীরু সরে বসলো। আমরাও সরে বসলুম।

জিনি বসলো। বীরু একটা সিগারেট ধরালো। কড়িকাঠের দিকে তাকালো। চাইলো আমাদের দিকে, জিনির দিকে। তারপর খুব আস্তে মোলায়েম স্বরে বললে, 'এটা কি ঠিক হলো?'

—আমায় বলছো? জিনি নরম চোখ তুলে প্রশ্ন করলে।

বীরু মাথা নাড়লে।

—কিসের কথা বলছো? জিনি জিজ্ঞাসা করলে।

—কিসের আর—এই ইয়ের, এই ব্যাপারটার—বীরুর গলায় যেনো কথা যোগাচ্ছে না। তিনু বীরুকে সাহায্য করলে।

—বীরু তোমাদের বিয়ের কথাটা বলছে।

জিনি বীরুর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো।

—বিয়েটা কি হলো ?

—ঠিক হলো না। বললুম আমি, 'নন্দ তোমার ঠিক ম্যাচ নয়—মানে মানায় না।'

—কেন ? জিনি তখনও ঠোঁট টিপে হাসছে।

—কেন কি, মানায় না, মানানসই নয় বলে। হাজার হোক, নন্দ একটা থার্ড ক্লাস লোক, আলুওয়ালা। কি তার স্ট্যাটাস। ভদ্রসমাজে ওর জায়গা নেই। বীরু উত্তেজিত হয়েছে দেখলাম।

জিনি সব শুনলো। উঠলো তক্তাপোশ থেকে। তাকালো আমাদের দিকে একে একে। ঠোঁটের কোণে তার হাসি নেই, আর তার বদলে আশ্চর্য একটা কাঠিন্য। খুব ধীরে ধীরে স্পষ্ট উচ্চারণে জিনি জবাব দিলো, 'ভদ্রসমাজে জায়গা তো আমারও নেই।'

—কে বললে ? বীরু আপত্তি জানালো, 'তুমি আমাদের বন্ধু—বরফ সাহেবের মেয়ে, আলবাৎ তোমার ভদ্রসমাজে জায়গা আছে।'

—নাকি ? তবে, তবে তোমরা অভদ্র, বাজারের আলু-ওয়ালা একটা মাতালকে রাতদুপুরে আমার বাড়িতে তুলে দিয়ে গেলে কেন ? জিনির গলার স্বর থরথর করে কাঁপছে।

আমরা চুপ। বিহ্বলবাক্। বীরু অনেক কষ্টে দোষ কাটাবার চেষ্টা করলে, 'অন্যায়টা কি করেছি ? আমরা শুনেছি, নন্দ—নন্দ তোমার কাছে আসতো।'

—তোমরাও তো আসতে। তা বলে তোমরা—জিনির বাঁকা হাসি ধারালো ছুরির মত আমাদের অতি গোপন বিষ-ফোড়াসম মনোবাসনাকে মুহূর্তের মধ্যে প্রকাশ্য আলোয় উন্মুক্ত করে দিলো।

তিন বন্ধু আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে চোখ নীচু করলাম।

—বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে, জিনি। বীরু উঠতে উঠতে বললো, 'আর কারুর কথা জানি না, আমি কোনদিন তোমার ঘরে ঢুকি নি। দরজার বাইরেই থেকেছি। দেখতে আসতুম, তোমার লীলাখেলা কেমন চলছে।'

—অযথাই? জিনি এবার জোরেই হাসলো শুধু।

—অযথা-ফযথা জানি না। তোমায় দেখা—মানে তুমি যাতে খারাপ হয়ে না যাও, তা দেখা আমার কর্তব্য—মরাল রেস্‌পন্‌সিবিলিটি বলে ভেবেছি।

বীরুর কথা শেষ না হতেই তিনু দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'আমিও তাই। তোমার ঘরে ঢোকার জন্যে আসতাম না। অতো ছোটলোক ভেবো না আমায়।'

এবার আমার পালা। আমিও উঠতে উঠতে বললুম, 'সকলকে সমান ভেবো না, জিনি। আমি নন্দ নই।'

—জানি। নন্দও তোমাদের মতন নয়। তোমরা অনেকবার এসেও দরজা খোলা পাও নি। সে একবার এসেই—

আমরা তিনজনে ততক্ষণে ঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছি। ঠিক এই সময় দরজা দিয়ে চীৎকার করতে করতে নন্দ ঢুকলো।

সঙ্গে তার দুই ভদ্রলোক। একজন তার মধ্যে উকিল। চিনি তাকে। এ পাড়াতেই থাকেন।

—তোমরা এসেছো, ভাই। কি খুশীই যে হয়েছি! কতক্ষণ এলে? বাইরে কেন? চলো, চলো, ঘরের ভেতর চলো—নন্দ আমাদের দু-হাত দিয়ে ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো।

সমস্ত অবস্থাটা তখন এমনই হয়ে এসেছে যে, আমরা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি নির্বাক, বিমূঢ় হয়ে, আর দরদর করে ঘামছি।

শুনলাম, নন্দ বলছে, 'বসুন স্যার—বসুন; বসুন উকিলবাবু, তোমরাও বসো ভাই। স্যার, এরাই আমার বন্ধু, ওঁরও বন্ধু। এরাই সাক্ষী দেবে।'

—সবই রেডি। তবে আর শুভকাজে বিলম্ব কেন? বললেন উকিলবাবু।

আমাদের চোখের সামনে পেট্রোম্যাক্সের নীলাভ আলোটা ধীরে ধীরে আবার স্পষ্ট হয়ে উঠছে, স্পষ্ট হয়ে উঠছে জিনির মুখ, ফুল-কাটা সুজনি, বেলফুলের প্লেট। দেখছি সেই স্যারকে—ধানবাদ কোর্টের কোন হাকিম বা মহকুমা অফিসারকে। কাগজপত্র বেরুলো, দু-চারটি প্রশ্ন করলেন স্যার।

—নিন্, সই করুন আপনারা। উকিলবাবু আমাদের দিকে তাঁর কলম এগিয়ে দিয়ে আহ্বান জানালেন।

আমরা তিনজনে তিনজনের দিকে তাকালাম। আমার বুকটা ধক্‌ধক্ করছে তখন। এই বুঝি হলো। এখুনি ঘরের

সমস্ত আলো দপ্ করে নিভে যাবে। ছুটে এসে পা জড়িয়ে ধরবে নন্দ ; ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবে জিনি।

অপেক্ষা করছি শেষ পরিণতিটুকুর জন্যে—বীরুর দিকে তাকিয়ে।

বীরু আর একবার আমাদের দিকে তাকালো। তাকালো জিনির দিকে। তারপর হঠাৎ এক লাফে ঘরের বাইরে এসে সোজা রাস্তা ধরে ছুট্।

আমরা প্রথমটায় হক্‌চকিয়ে গিয়েছিলাম। নন্দ, উকিলবাবু এবং স্যারও। পরমুহূর্তে ব্যাপারটা অনুধাবন করেই তিনু আর আমি বীরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করলাম।

নন্দ যখন হেই হেই করছে, ততক্ষণে আমরা রাস্তায়—বীরু অনেকটা আগে, আমি আর তিনু একসাথে ছুটছি প্রায়।

গলি পেরিয়ে বাজারের বড় রাস্তা—সেই রাস্তার অনেকখানি ছুটতে ছুটতে এসে আমরা দাঁড়ালাম অন্ধকারে—শিবমন্দিরের পাঁচিলের গায়ে।

সকলেই চুপ। কেউ কোন কথা বলছি না ; বলতে পারছি না। হাঁপাচ্ছি আর ঘাম মুছছি।

খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিশ্রী একটা অস্বস্তি জমে উঠতে লাগলো আমাদের মধ্যে। সবাই হয়তো মনে মনে জিনির বিবাহবাসরের কথা ভাবছিলাম।

সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে হঠাৎ বীরু বললে, 'তোরা যা তিনু, আমি একবার স্টেশন যাবো। বম্বে মেলের আর-এম-এসে

একটা জরুরী চিঠি ফেলার আছে।' কথা শেষ করেই বীরু আবার বাজারের পথ ধরে হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে গেলো।

বীরুর যাবার পথে তাকিয়ে তাকিয়ে তিনু যেনো কি ভাবলে। বললে, 'এখনও নিশ্চয় ন'টা বাজে নি—কি না রে, পাঁচু। যতীনবাবুর বাড়িটা একবার ঢু' দিয়ে আসি—কি যে করছেন ভদ্রলোক চাকরির এ্যপ্‌লিকেশন্‌খানা নিয়ে।' কথার শেষে তিনুও অপেক্ষা না করে শিবমন্দিরের বাঁ দিকের পথ ধরলো।

আমি একা। বীরু, তিনুর যাবার পথে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো আমার। পা-পা করে এগিয়ে চললাম। কোথায় যাবো ? কোথায় ? সামনেই ম্যাক্‌ সাহেবের বাঙলোর মাঠ। তার টপকে সেই মাঠে গিয়ে বসলাম।

অন্ধকার। জলো বাতাস ভেসে আছে হুহু করে। ভিজে ঘাসের ঠাণ্ডা লাগছে হাতে-পায়ে। আকাশে চাঁদ নেই, তারা নেই। মেঘ জমছে।

সন্ধ্যেবেলার ঘটনাটাই চোখের ওপর ভাসছে তখনও। দেখছি—সেই ঘর, সেই আলো, জিনি, জিনির খোঁপা, খোঁপার ফুল। কি হলো শেষ পর্যন্ত, কে জানে ! ভেস্তে-যাওয়া বিয়ের বর-কনে নন্দ আর জিনি পেট্রোম্যাক্স নিভিয়ে ধুলোয় বুঝি গড়াগড়ি দিচ্ছে। কাঁদছে নন্দ, কাঁদছে জিনি—। নাকি অন্য কিছু !

অসম্ভব কৌতূহল হলো আমার। জিনিদের বিয়ের বাসরের পরিণতিটুকু না দেখলে যেন সব—সব বৃথা হয়ে যাবে। দোষ

কি? কেউ তো আমায় দেখছে না। একবার উঁকি মেরে দেখেই চলে আসবো।

উঠে বসলাম। পিছনের পথ ধরে এগিয়ে চললাম জিনিদের গলির উদ্দেশে।

গলিটায় পৌঁছনো গেলো। অন্ধকার গলি। দু-একজন লোক যাওয়া-আসা করছে। দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়লো। গা ঢাকা দিয়ে দিয়ে এগিয়ে এলুম জিনির বাড়ির কাছে। দরজার একটা পাট ভেজানো। আর একটা দিয়ে আলো আসছে তখনও— সেই নীলাভ আভা। তা হলে? তবে কি নন্দ—? পা টিপে টিপে যেই খোলা দরজার কাছে গিয়েছি, মাথা বাড়াবো— হঠাৎ কে যেনো ডাকলো নাম ধরে।

চমকে উঠে পালাতেই যাচ্ছিলাম—দেখি, পাশে বীরু।

—তুই? আমি আকাশ থেকে পড়লুম।

—তিনুও এসেছে, আস্তাবলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

তিনু এগিয়ে এলো। আমরা তিনজনেই দাঁড়ালাম জিনির দরজার সামনে।

—চল্—ফিরে চল্। বললে বীরু।

—ওদের কি হলো? প্রশ্ন করলুম আমি।

—যা হবার। গম্ভীর হয়ে জবাব দিলে বীরু, 'উকিল থাকতে আবার বিয়ের ভাবনা। ব্যাটা নন্দর ওপর যা রাগ হচ্ছে—যত সব বাজে লোক ধরে এনে বিয়ের সাক্ষী দেওয়ালে শেষ পর্যন্ত। কি হয়েছিলো একটু সবুর করতে। আমি তো একটু পরেই এলাম।'

—তুই বুঝি অনেকক্ষণ এসেছিস ? আমি প্রশ্ন করলুম।

—এলাম। কি করবো ? তোদের ছেড়ে দিয়ে ভাবলাম, কাজটা ঠিক হয় নি। আফটারঅল্ নন্দ, জিনি, দু জনেই আমাদের বন্ধু—একটা মরাল রেস্পন্সিবিলিটি আছে তো ! সইটা করেই দি ! গম্ভীর সুরে বললো বীরু।

—যা বলেছিস ভাই। আমারও তাই মনে হলো। শেষ পর্যন্ত এলুম সই করতেই। বললে তিনু।

—আমিও ওই কথাই ভেবেছি। বীরুর দিকে তাকিয়ে বেমালুম বলে দিলাম, 'সইটা করেই কেটে পড়তাম।'

তিন বন্ধু ফিরে চললাম। আমরা এসে মরাল রেস্পন্সিবিলিটি পালন করার আগেই ইম্মরালের দল এসে সেটা পালন করে গেছে। জিনি আর নন্দ এতক্ষণ নীলাভ আলোর তলায় নক্শা-কাটা সুজনির ওপর বসে হয়তো হাসছে কিংবা—

পাঁচুদা গল্প শেষ করে নীরবে হাসলেন শুধু।

অনেকক্ষণ পরে কেষ্ট জানতে চাইলো, 'থাকিস কুথায় আজকাল ?'

—ভাগাড়ে। তিক্ত সুরেই জবাব দিলে গঙ্গামণি, 'কপাল বটেক্ আমার, পাটরানীর কপাল রে কিষ্টো—আজ হেথায় কাল হোথায়, কেউ দিলেক শুতে তো ঢাকায় শুলাম, না দিলেক তো নালায়। শেয়াল-কুকুরের পারা দিন কাটাই।'

গঙ্গামণি থামলো। তিক্ত সুর ওর মুখকে আরও বিকৃত, বীভৎস করে তুলেছে ;

কেষ্ট চুপ। মনে মনে তার অনেক কথাই জমছে আস্তে আস্তে। গঙ্গামণির চেনা রূপটাও সেই সঙ্গে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে তার কাছে।

কেষ্টর শীত করছিলো। পা পা করে সে মেলার দিকে আবার এগুতে লাগলো। গঙ্গামণিও।

মেলার প্রায় কাছাকাছি এসে গঙ্গামণি প্রশ্ন করলে,— 'এদিক পানে যাস কুথায় ?'

—ঠাণ্ডা লাগে বড়। উই যে কোণে চায়ের দোকান দিয়েছে শেতল—ডু খুরি গরম চা খেয়ে লি উর দোকানে।

—মন্দ লয় ! গঙ্গামণিও চা খাবার লোভে আনমনা হয়ে উঠলো। বললে, 'তুই ক্যানে চায়ের দোকান দিলি না, কিষ্টো ? ডু পয়সা তুর আসতো।'

সে কথার কোন জবাব দিলো না কেষ্ট।

দোকানের বাইরে, একটু তফাতে চায়ের খুরিতে ঠোঁট ঠেকিয়ে গঙ্গামণির লোভ বাড়লো আরও। বললে, 'বুঝলি

নাকি রে, কিষ্টো—তুর ই চা-পানিতে পেটের জ্বলনটা আগুন 'ধরাই দিলেক্।' একটু থেমে আবার, 'বুঝ্ ক্যানে, চারবেলা পেটে ভাত লাই। সে তুর কুন্ সকালে ছুটা ফুলারু খেলাম, সব্বনেশে খিদায় পেট ডুমড়ায়, তিতা জল কাটে মুখে।' কথার মাঝে থেমে গঙ্গামণি সটান হাত পাতলো। কাকুতি করে বললে, 'দে না ক্যানে গুটেক পয়সা। মুড়ি-চিঁড়া কিনা খাই।'

কথা বলার মতো কিছু খুঁজে পেলো না কেষ্ট। পকেট থেকে একটা সিকি বের করে গঙ্গামণির হাতে দিলো।

সিকি তো নয়, যেন সাত রাজার ধন এক মানিক—খুরির গরম চা-টুকু এক চুমুকে নিঃশেষ করে গঙ্গামণি সিকিটা মুঠির মধ্যে জোরে চেপে ধরলো। শীতের কাঁপুনির মধ্যেও বেশ একটু গরম পেয়েছে সে। চায়ে, না সিকিতে, কে জানে!

মেলার এদিক-ওদিক তীক্ষ্ণ চোখে নজর করে গঙ্গামণি দ্রুতনিঃশ্বাসে বলে, 'তু দাঁড়া কিষ্টো, হেথায়। হুই একটা ময়রার দোকান দেখি খুলা আছে। চট্ করে এলাম আমি।'

প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না রেখেই গঙ্গামণি হাওয়ার বেগে ছুট দিলো। চোখের পলকে অদৃশ্য।

সেদিক পানে তাকিয়ে গঙ্গামণিকে হঠাৎ চেন্না-দেওয়া জিনিসের মতই চেনা গেলো। স্পষ্ট, সহজভাবেই। কার্বাইটের ফ্যাকাশে আলো-ছড়ানো এই মেলার ভিড়েই। মনে পড়লো কেষ্টর সেই পুরনো গঙ্গামণিকে; সেই চিল-চোখ, হাভাতে, হ্যাংলা, লোভী, দস্যি মেয়েটাকে। আর মনে পড়লো

গত সনের কথাও। যে সনে আকাল হলো ; চাল গেলো, চুলো গেলো গঙ্গামণিদের ; জাত গেলো, ধর্ম গেলো ; প্রাণও।

জলের মতোই মনে পড়ছে সে-সমস্ত কথা।

চাঁচুরিয়াতেই প্রথম দেখা, গঙ্গামণি আর কেষ্টর। তখন ওদিকপানে আকাল লেগেছে। চালের আকাল। আকাল যদি চালের হয়, বাকি থাকে কি ? গোড়া শুকোলো তো গাছ মরলো, ফুল-পাতা মুড়োলো।

তেমনি। রাক্ষুসে একটা টান দিয়ে কেউ যেনো ওদের পায়ের মাটি ধসিয়ে দিলে ; ছুঁড়ে ফেলে দিলে মাথার চালা। দলে দলে গঙ্গামণিরা বেরিয়ে পড়লো গ্রাম ছেড়ে, ভিটেয়-ভিটেয় পিত্তবমির থুথু ছিটিয়ে।

দেড়বিত্তের শহর চাঁচুরিয়া। সেই শহরই দেখতে দেখতে ভরে গেলো হাভাতেদের ভিড়ে। এ শহরেও তখন চাল বাড়ন্ত। ইঁট-টালির কারখানার স্টোর থেকে চুপিচুপি চড়া দরে চাল এনে আরও চড়া দরে বাজারে বিক্রি করছে মহাজনের ছুটকো দালালরা। রেল-স্টেশনের গুদাম থেকেও আসছে চোরা পথে ; সে চাল তো চাল নয়, যেন সাদা হাড়-বাঁধানো পালিশ-দেওয়া খুরো গুঁড়ো।

জনমানুষের কমতি নেই চাঁচুরিয়ায়। যারা আছে, তাদেরই ভাতের-পাতে টান ; তার ওপর এই নতুন উপসর্গ। ঘরের চৌকাঠে ওদের মাথা ঠুকতে দেখলেই গৃহস্থজন খেঁকিয়ে ওঠে,

ওরে, ও হারামজাদার দল, বলি চাল কি এখানে আকাশ থেকে বৃষ্টি হলো ?

প্রথম-প্রথম ওরাও জবাব কাটতো। বলতো, গাঁয়ে শুনলাম, হেথা রাজায় গোলা বাঁধলেক ধানের। ঠাকুর গো, দু মুঠা ভাতের লেগে এলাম হেথায়। ইস্‌টিশনের মালগুদামে কাঁড়ি কাঁড়ি চাল, কারখানার ফটক-ঘরে বস্তা বস্তা চাল—আপন চোখে দেখলাম, ঠাকুর। হেথা আকাল হবেক ক্যানে, কও ?

ঠিক। চাঁচুরিয়াতে রাজায় গোলাই বেঁধেছে বটে। তবে সে গোলাতেই যা না, হতভাগার দল। মরতে বাড়িতে, পথে-ঘাটে পেট চিতিয়ে পড়ে থাকিস কেন ?

পড়েই থাকে ওরা। পথে, ঘাটে, পাথর-বাঁধানো মাল-গুদামের রাস্তায়, স্টেশনের ওভারব্রিজের তলায়। রোদ্দুরে, ঝড়ে, বৃষ্টিতে, কলেরা-বসন্তর মধ্যেই।

দিন যায়। দু-দশ জন সরে পড়ে, রেলের চাকার তলায় গলা দেয় ক'জন, একদল যায় কলেরায়, একদল বসন্তে, না খেয়ে-খেয়ে ঘিয়ে-ভাজা কুকুরের মত কুৎসিত, নগ্ন ধড়টাকে রাস্তায় ফেলে রেখে কেউ কেউ আবার স্বর্গবাসী হয়।

তবু যদি ওরা একসাথে সব ক'টা গিয়ে দামোদরের জলে ডুবে মরে, কি অন্যত্র চলে যায়, যেখানে রাজায় ধানের গোলা বাঁধে নি! তা যাবে না।

এখানেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে, হাড়গিলে রুগ্ন গরুর মত ধুঁকে ধুঁকে শ্বাস টানবে, কথা বলবে, কাঁদবে। ঠিক মনে হবে, কাঁচা পথ দিয়ে বলদটানা গাড়ির চাকায় শব্দ উঠছে—

কাতরানো, কর্কশ, করুণ। ওরা কচ্ছপের মত মুখ লুকিয়েছে বুকের তলায়। গায়ে চামড়া-পোড়া গন্ধ।

সারা শহরটা ওরা বিষিয়ে দিলে। আবর্জনায়, নোংরায়, মলমূত্র আর প্রকাশ্য ব্যভিচারে।

'টাউন রেস্টুরেন্টের' টেবিলে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে কেষ্ট সবই দেখতো। আজ তিন বছর সে এখানে—এই চাঁচুরিয়ায় চায়ের দোকানে কাজ করছে। মালিক বদল হলো দোকানের, কলি ফিরলো, সাইনবোর্ড উঠলো মাথায়, টেবিল-চেয়ারও এলো—কেষ্ট কিন্তু সেই কেষ্টই। তার আর কোথাও বদল নেই। সেই ময়লা নীল হাফপ্যান্ট আর আধহাতা গেঞ্জি। এই চায়ের দোকানে আগে খদ্দের ছিলো না, এখন খদ্দেরের ভিড় কতো। সকাল থেকে চা দিয়ে দিয়ে, মামলেট ভেজে কেষ্টর হাতটাও অবশ হয়ে আসে আজকাল। নতুন একজন কারিগর এসেছে দোকানে। এতোদিন একলাই ছিলো কেষ্ট। এখন দু'জন। নতুন কারিগর চপ-কাটলেট ভাজে, মাংস রাঁধে, ডিমের ঝোল।

কোথায় ছিলো এতোদিন এইসব খদ্দেররা? চপ, কাটলেট আর ডিমের ঝোল যারা তারিয়ে তারিয়ে খায়—সিগারেট ফোঁকে, চায়ের কাপে ঠোঁট ঠেকিয়ে ফিসফিসিয়ে কথা বলে? চোখের টোপ নিয়ে বসে আছে সর্বক্ষণ?

তাজ্জব লাগে কেষ্টর। সতেরো-আঠারো বছর বয়সের ছেলে—চায়ের লিকার দেখে দেখে আর কাপ ধুয়ে ধুয়ে যার মনটাই জলো-জলো হয়ে থাকলো, সেই কেষ্ট ভেবেই পায় না,

চালের আকালে দেশটাই যখন জল-ভিক্ষু চাতক পাখির মতো শূন্য চোখে চেয়ে রয়েছে, তখন এই বাবুরা কেমন করে, কোথা থেকে আসে, চক্‌মক্‌ করে, কাটলেট মুখে পুরে দিব্যি চিবোয়, মাংস খেয়ে হাড়গুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয় পথে। ঘূর্ণি বয়ে যায় হাভাতেদের সেই হাড় কুড়োনোর পাল্লায়।

ভাবতে বসলে কেষ্টকে 'সুসমাচার' খুলে বসতে হয়। মথি, যোহনের সুসমাচার আজো আছে কেষ্টর কাছে। আছে একটা ছেঁড়া-ফাটা বাইবেল। কাজের শেষে, রাতে, দোকান বন্ধ হলে রেস্টুরেণ্টেরই এক চিলতে পর্দা-ফেলে আড়াল-করা রান্নাঘর থেকে কেষ্ট তার বিছানাপাটি নামিয়ে নিয়ে বেঞ্চি জোড়া দিয়ে শুয়ে পড়ে। তখন কেরোসিনের কুপি। সেই কুপির আলোয় কেষ্ট তন্নতন্ন করে খোঁজে মথি, লুক, যোহনের সুসমাচারের কোথায় আছে এদের কথা। এরা—যারা চাঁচুরিয়ায় এসেছে ক্ষুধার তাড়নায়, আর ওরা—যারা ডিমের লালচে ঝোল চামচে ডুবিয়ে হুসহুস করে খায়।

কুপির আলো ধরে কেষ্ট যীশুর ছবিও দেখে। মিশনারি থেকে দিয়েছিলো কবে, কোন্ যুগে, সেই ছেলেবেলায়—কেষ্ট যখন মিশনারির বাগানে ছিলো, কাজ করতো মালিদের সাথে। সে ছবি আজ কালিতে-ধুলোতে ময়লা, বিবর্ণ। কিন্তু তবু আছে—কেষ্টর কাছে, রেস্টুরেণ্টের খুপরিতে দেওয়ালে আঠা দিয়ে আঁটা।

মাথায় কাঁটার মুকুট, কপালে রক্ত-বিন্দু—করুণ নেত্র, যীশু চেয়ে আছেন ঊর্ধ্বপানে। কুপির শিস্-ওঠা লালচে

আলোতো সে মুখ, সে চোখ, সে নগ্নগাত্র যীশু কেষ্টর কাছে আজকাল আরও রহস্যময় মনে হয়।

আঠারো বছরের কেষ্ট—ভালো করে জ্ঞান হওয়ার পর থেকে যে অরফ্যানেজে মানুষ, মিশনারি কুঠিতে গতর দিয়েছে, রুটি খেয়েছে, লাল টালি-ছাওয়া গীর্জেয় অর্গানের সুরে সুরে প্রেয়ার করছে ঠোঁট নেড়ে—সেই কেষ্টপদ দাস অবশেষে বুঝি একটা সান্ত্বনা খুঁজে পেলো। উর্ধ্বনেত্র যীশুর ছবির দিকে চেয়ে চেয়ে কেষ্ট যেনো বুঝতে পারলো, এ অন্যায়ের বিচার স্বর্গে।

আর এই যে তছ্‌নছ্‌ অবস্থা, কদর্য ভিড়, খেয়োখেয়ি, ঘিনঘিনে নোংরামি, এ আর কিছু নয়—অপদূতে পাওয়া অবস্থা। বেলসেবুবের সাত অনুচর—সাত শয়তান অট্টহাস্য হাসছে। তাদের দাপটে মেঘ হলো না আকাশে, বৃষ্টি নেই, জল নেই। শয়তানদের নিঃশ্বাসে ধানের শীষ শুকিয়ে গেলো, ফসল ফুরালো মাঠে-মাঠে।

এমনই হবে না? আকাশ থেকে আগুন আর গন্ধকের বৃষ্টি নেমে এসে প্লাবন বয়ে যাবে। নিশ্চিহ্ন হবে পাপ; তবেই মনুষ্য-পুত্র আত্মপ্রকাশ করবেন।

সেই আগুন আর গন্ধকের বৃষ্টিতেই না চাঁচুরিয়ায় প্লাবন ডেকেছে। তীব্র জ্বলনে, কটু গন্ধে এর আকাশ-বাতাস ভরা। সাত শয়তানের ছিটিয়ে দেওয়া আবর্জনায় মানুষের গায়ে নোংরা, মনে নোংরা।

ঠিক এমন সময়ই গঙ্গামণির সঙ্গে দেখা। চাঁচুরিয়া যখন আর চাঁচুরিয়া নয়; নরক। নরক।

ভোলাবাবুদের গদিতে চায়ের অর্ডার ছিলো। বাবুদের চা খাইয়ে হাতের আঙ্গুলে এঁটো চায়ের কাপ আর কেটলী ঝুলিয়ে কেষ্ট বাজারের রাস্তা দিয়ে আসছে। এমন সময় চোখে পড়লো দৃশ্যটা। কালিময়রার দোকান থেকে তার কর্মচারী নিতাই এঁটোকাঁটার আর ছেঁড়া-পাতার জঞ্জাল ফেলা টিনটা হাতে করে রাস্তায় নামতেই চারপাশ থেকে ভিখিরী ছেলে-ছোকরা-গুলো তাকে ঘিরে ধরলো। রাস্তার ওপাশে নর্দমা। ওপারে গিয়ে জঞ্জালগুলো ফেলে দেবে নিতাই। কিন্তু কার সাধ্য এক পা এগোয়। ছিনে জোঁকের মত তাকে আটকে ধরেছে।

গালাগাল দিতে দিতে নিতাই দু-এক পা মাত্র এগিয়েছে, এমন সময় কে বুঝি বেকায়দায় পথ আটকাতে গিয়ে নিতাইয়ের পায়ে পা জড়িয়ে ফেললো। টাল সামলাতে গিয়ে নিতাইয়ের হাতের টিন ছিটকে পড়লো রাস্তায়, ঠিক মাঝ রাস্তাতেই। মারমুখো হয়ে নিতাই ঘুরে দাঁড়াতেই ভিখিরীর বাচ্চাগুলো দু পা হটে এলো। আবার এগুবে এগুবে করছে, এমন সময় ক'পা দূরেই মাল বোঝাই লরী। সরে গেল নিতাই, পথ ছেড়ে পালালো ভিখিরীর বাচ্চাগুলো। রাস্তা ফাঁকা। উচ্ছিষ্ট ছিটোনো, পাতা ছিটোনো টিনটা পড়ে আছে মাঝ রাস্তাতেই। হঠাৎ কোন এক অদৃশ্য কোণ থেকে একটা চিল ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই উচ্ছিষ্ট ভর্তি টিনটার ওপরেই। চেঁচিয়ে উঠলো পথ চলতি লোকজন। মালগুদোমের রাস্তা থেকে বেরিয়ে মোড় ঘুরে সবেমাত্র গিয়ার বদলেছিলো লরীটা।

পুরোদমে ব্রেক কষলো। চাকা ঘষড়ানোর তীক্ষ্ণ, কর্কশ, আওয়াজ উঠলো, বুক কাঁপানো আওয়াজ।

সবাই কিন্তু অবাক। উচ্ছিষ্ট-ভর্তি টিন সামনে ছড়ানো; যা পেয়েছে, সপ্টে-সাপ্টে আঁচলে তুলে, হাতে পুরে চোখের নিমেষে লিকলিকে বেতের মত মেয়েটা উধাও। ঠিক যেনো একটা চিল চোখের পলকে ছোঁ মেরে আবার উড়ে গেলো। আশেপাশে কোথাও তার চিহ্ন নেই।

কেষ্টর বুক ধক্ ধক্ করে উঠেছিলো। সে কাঁপন থামলো দোকানে ফিরে, জল খেয়ে।

পরেরদিন আবার দেখা। ওভাবব্রিজের তলায়, একাগাড়ির স্ট্যাণ্ডে। দেখার সাথে সাথেই চিনতে পারলো কেষ্ট। সেই কালো চিল।

স্টেশন থেকে ফিরছে কেষ্ট টিকিট বাবুদের চা-টোস্ট খাইয়ে, খবরের কাগজ আর পাঁউরুটি-বিস্কুটের হাত-ঝোলানো ঝুড়িটা নিয়ে।

কেষ্টর হাতের ঝুড়ির দিকেই তাকাচ্ছিলো মেয়েটা সোজাসুজি। রোজই হয়তো তাকায়। কিন্তু আগে কোনদিন কেষ্ট এই সাধারণ ব্যাপারটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেনি। আজ করলো।

দাঁড়ালো কেষ্ট। তাকালো একটু। তারপর কাছে ডাকলো।

কালো চিল কাছে এলো। একেবারে গায়ের কাছেই।

—তুর নাম কি ? কেষ্ট প্রশ্ন করলে।

—গঙ্গামণি। চট্‌পট্ জবাব গঙ্গামণির।

—নামটা তো তেমন টগবগে লয়। এলি কোন্ গাঁ থেকে?

—ধলগাঁ। নদী-পারে ছষ্টিপুর, তার পাশেই বটে গ।

—বটেক্, ধলগাঁ? কেষ্ট এক মুহূর্তে নীরবে কি ভাবলো যেনো। গঙ্গামণিকে দেখলো নজর করে। কালো চিলকেই। কাঠি গা, তবু গড়নে, চোখে, চুলে ছিটে-ফোঁটা রূপ আছে।

—ধলগাঁ চিনি। দু'কোশ তফাতে গাঁ আমার কাকুড়গাছি। কেষ্ট আবার একটু থেমে প্রশ্ন করলে, 'উদিক পানেও আকাল?'

—কুথায় লয়? গঙ্গামণি ধারালো দৃষ্টিতে কেষ্টকে যেন ব্যাঙ্গ করে বললে, 'সগ্গ, মত্ত, পাতাল সরবত্রই। তুর গাঁ আমার গাঁ সতন্তর লয়, পিরথিবী ভরেই আকাল।'

কেষ্ট চুপ। একটু সরে এদিক ওদিক তাকিয়ে রেস্টুরেন্টের পাঁউরুটি-বিস্কুটের ঝুড়ি থেকে দুটো মিষ্টি বিস্কুট দুটো ফেলে দিয়ে বললে, 'কাল তুই অমন করে গাড়ির সামনে ঝাঁপাই পড়লি যে—ভাগ্যি জোরে বেঁচে গেলি নয়তো কাটা গেতিস। তুর কি ভয় ডর নাই রে?'

বিস্কুটে দাঁত বসিয়ে গঙ্গামণি ঠোঁট বেঁকালো। জবাব দিলে, 'কাটা পড়লে লিশ্চিন্ত হতুম গ'। পেরাণ গেলে পেট থাকতো লাই। পেটের জ্বালা সবনেশে জ্বালা; কেউটে সাপের কামড়। সে জ্বলনের কাছে মরণ ডরায়।' কথার শেষে গঙ্গামণি কুকুরের মত অদ্ভুত এক শব্দ করে হাসলো।

গঙ্গামণির সে হাসি কেষ্টর মরমে এসে বিঁধলো। ঠাঁই পেলো বরাবরের জন্যেই।

অন্তরঙ্গ হলো এই পরিচয় দিনে দিনে।

কেষ্টর তরফে বলার কথা সামান্য। কেষ্টপদ দাস অল্প বয়স থেকেই অনাথ। মিশনারীদের কাছে থেকেছে, খেয়েছে, প'ড়েছে। তারপর হেথা-হোথা ঘুরে এখানে এলো, চাঁচুরিয়ায় তিন বছর আগে। সেই থেকে সে চায়ের দোকানে কাজ করে। ও কিন্তু কৃশ্চান।

কেষ্টর সঙ্গে ভাব হওয়ার পর গঙ্গামণির কষ্ট একটু তবু ঘুচলো। আগে নিত্য অনশন, এখন তবু টুক্‌টাক্ জুটে যায় কেষ্টর কল্যাণে। রেস্টুরেন্টেরই আশেপাশে চিল-চোখে সর্বক্ষণ সে টহল দিচ্ছে। ও এলাকাটা যেন ওর। সেখানে আর কাউকে হাত বাড়াতে দেখলেই চুলোচুলি শুরু করে। এদিকে মালিক আর কারিগরের চোখ বাঁচিয়ে কেষ্ট গঙ্গামণির আঁচলে এটা-ওটা ফেলে দেয়। ফাঁক পেলেই এই দয়া-দাক্ষিণ্য।

রোজকার ব্যবস্থাটা কিন্তু ছিল রাত্রেই, মালিক যখন চলে যায়, কারিগর বিদেয় নেয়, তখন। গলির পথ দিয়ে গঙ্গামণি রেষ্টুরেন্টের পেছোন দবজায় হাজির।

—কি-ই-ষ্টো, উ কিষ্টো। আস্তে আস্তে নীচু গলায় ডাক দেয় গঙ্গামণি।

কেষ্ট মুখে কোন শব্দ করে না। নীরবে রেস্টুরেন্টের পড়তি বা বাড়তি মালের খানিকটা জালির ফুটো দিয়ে গঙ্গামণির ভাঙ্গা টিনের থালায় ঢেলে দেয়।

খুশী গলায় গঙ্গামণি বলে, 'তুর মত মনুষ্যি নাই রে ই জগতে।'

ক'দিনেই গঙ্গামণির লোভ আরও বেড়ে ওঠে : উ কিষ্টো, গুটেক্ মাস্ দে-না। কাল তো শুধুই কাদা পায়া ঘঁটানো ঝোল দিলি। ভাত লাই একটুকুনও ?

নিজের ভাত থেকেই কেষ্ট খানিকটা ভাত দিয়ে দেয়। না বললেও সে যে দেয়না, তা নয়। তবে রোজ হয়ে ওঠে না। মালিক মাপ করে চাল দিয়ে দেয় কেষ্টকে হপ্তাভোরের। আগেভাগে ফুরোলে কিনে খাও।

আশ্চর্য মেয়ে এই গঙ্গামণি। কেষ্ট দেখতো আর ভাবতো। আর ওর লোভ, পেটের জ্বালা—তা এতো উগ্র, তীব্র যার বুঝি তুলনা নেই। লোভের আভায় গঙ্গামণির চোখ দগ্‌দগে ঘায়ের মত জ্বলতো।

গঙ্গামণিকে দেখে কেষ্টর মাঝে মাঝে মনে হতো, মেয়েটা যেন গন্ধকেরই ঝড়। কটু, তীব্র, বিষাক্ত।

তবু গঙ্গামণিকে কেষ্ট ভালোবাসতো। কেন যে, কে জানে ? প্রতিবেশী গ্রামের মেয়ে বলে কি ? না, আরও কিছু ?

এ রকম ভাবেই কেটে যাচ্ছিলো দিন। বাধ সাধলো গঙ্গামণি নিজেই। তার নিত্য নতুন ফন্দি-ফিকির করে রেস্টু-রেন্টের দরজা ঘেঁষে এসে দাঁড়ানো, আর প্রত্যহ এটা-ওটা চাওয়া সমস্ত ব্যাপারটাকেই ফাঁসিয়ে দিলে মালিকের কাছে। কারিগর ব্যাটা সন্দেহ করতে শুরু করেছিলো আগে থেকেই, ইতর রসিকতাও করতো কেষ্টোর সঙ্গে তা নিয়ে। শেষাবধি মালিককে চুগলি। হাতে নাতে বামাল ধরা পড়েনি কেষ্ট এই যা রক্ষে। শাসানি, ধমকানি খেয়ে কেষ্ট হাত টান করলে।

গঙ্গামণির জিবে তার জন্মে গেছে ততদিনে। সে ছটফটিয়ে ঘুরে মরতে লাগলো রেস্টুরেন্টের এপাশ ওপাশ।

এমন সময় হঠাৎ ক' দিন গঙ্গামণি উধাও। পাত্তা নেই তার। দিন চারেক পরে ওভারব্রিজের তলাতেই দেখা।

—হঠাৎ করে গেলি কুথায় তুই? কেষ্ট প্রশ্ন করলে।

গঙ্গামণির গায়ে একটা নতুন কোরা শাড়ি। মাথার চুলগুলো তেল-চক্চকে।

—চাকরী নিলাম রে, কিষ্টো। বাবুর বাসায়। খুশীতে গঙ্গামণি ঢলে পড়ছে।

—কোন্ বাবু?

—লাম টাম জানি নাই। উ-ই যে বাবু, তুর দোকানে ঝুড়িঝুড়ি খাবার খেতে আসেক্ রে। ডুব্লা গোছের, চোখে কাঁচ, সাদা পারা দেখতে।

রোগা, চশমা পরা, ফর্সা বাবুটি যে কে, কেষ্ট বুঝতে পারলো না প্রথমে। পরে বুঝলো। বাবু নতুন। একেবারেই নতুন এ শহরে।

—বাবুর বাড়ি কুথায়?

—হুই যে, রেলপারে, যেথায় সাঁকো আছে।

কেষ্ট মনে মনে জায়গাটা ভেবে নিলে। বাবুটিকেও ভালো করে মনে করলো। তারপর বললে, বাবুর বাসায় কোন্ কোন্ জন থাকে?

—কেউ লয়। ফাঁকা। জবাব দিলে গঙ্গামণি আরও

জাতটাতও মানে না রে, কিষ্টো। আমার হাতের ছোঁয়া খায়। তিনদিন পেটপুরে ভাত খেলাম। গঙ্গামণি এমন একটা মুখভঙ্গী করলে যেন ওর মুখে এখনো সেই ভাতের গন্ধ।

কেষ্ট একটা বিড়ি ধরিয়ে গঙ্গামণিকে ভালো করে নজর করলো আবার। গঙ্গামণির গা-গতরে একটু যেন ঢল নেমেছে আজকাল।

—দেখ্, গঙ্গামণি। কেষ্ট বললে ভেবে চিন্তে, 'এই আকালে শহরে অনেক হুটকো লোক এলো। অনেক ভদ্দরলোক বাবু। কিন্তুক্ মানুষগুলোকে মনে লয় না। মন্দ ঠেকে। বরং ই তোর পথঘাটই ভালো ছিল, রে।'

কেষ্টর কথায় গঙ্গামণি বাধা দিলে।

—আক্‌বকের কথা কাড়িস না, কিষ্টো। শাড়ি দিলেক, ভাত দিলেক, মানুষটা মন্দ হবে কিসের লেগে? উ দেবতার বংশ।

কেষ্ট চুপ করে গেলো।

গঙ্গামণির সঙ্গে আর দেখা হলো না। সপ্তাহ কাটলো, মাস কাটলো। সেই ফর্সা মতন চশমা চোখে বাবুটিও আর আসে না। একদিন কেষ্ট গেলো গঙ্গামণির খোঁজ নিতে। সাঁকোর কাছে বাড়ি আছে বটে, তবে সেখানে গঙ্গামণি নেই, সেই বাবুটিও না।

কেষ্ট ফিরে এলো। মনে পড়ছিলো গঙ্গামণির কথা: শাড়ি দিলেক, ভাত দিলেক, মানুষটা মন্দ হবে কিসের লেগে? উ দেবতার বংশ।

সেই শেষ। কেষ্টর মনে গঙ্গামণির রঙ দিনে দিনে ফিকে হয়ে আসছিলো।

হঠাৎ আবার এই নতুন করে দেখা—শালবনীর মেলায়, কার্তিক পূর্ণিমার রাত্রে, কার্বাইটের আলোয়। সেই গঙ্গামণি।

হাত ধরতে কেষ্ট চমকে উঠলো।

—পালালি কুথায়, তুই? খুঁজে খুঁজে হেদায় গেলাম। গঙ্গামণি আবার এসে কেষ্টর হাত ধরেছে।

পুরোনো কথা ভাবতে ভাবতে কেষ্ট কখন যেন মেলা ছেড়ে ফাঁকায় ফাঁকায় ঘুরে মন্দিরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলো।

—খেলি তুই?

—হাঁ। ফুরাইছিলো সব। চারগণ্ডা পয়সা—কি যে ছাতা-মাথা দিলেক রে কেষ্ট, গলাতেই সেঁদাই গেল। দে বিড়ি দে একটা। শীত করে বড়।

শীত করছিলো কেষ্টরও। গঙ্গামণিকে বিড়ি দিয়ে কেষ্ট আশে পাশে একটু ঢাকা জায়গা খুঁজে নিলো।

পাশাপাশি বসলো দুজনে, কেষ্ট আর গঙ্গামণি। মন্দিরের ভেতরে তখন পঞ্চকাল চাঁদের কলার হিসেব-মত-জ্বালা দেউটিকে ঘিরে শত শত মানসিক করা প্রদীপ জ্বলে জ্বলে নিস্তেজ হয়ে আসছে।

দুজনেই চুপ করে বসে থাকলো। কুয়াশা আরও ঘন হয়েছে, ফুটফুটে চাঁদের আলো এবার যেন শীতের দাপটে সাদা কাপড় জড়ানো গায়। দামোদরের চর থেকে ভিজে গন্ধ

ভেসে আসছে। সোঁদা, বুনো গন্ধ। গঙ্গামণির কাঁচপোকার টিপ খুলে পড়ে গেছে কোথায়।

—হঠাৎ করে তুই শহর ছেড়ে গেলি কুথায় রে, গঙ্গামণি? কেষ্ট প্রশ্ন করলে।

চট্ করে এবার আর জবাব দিতে পারলো না গঙ্গামণি। মুখ বুজে বসে থাকলো অনেকক্ষণ। পরে, কথার জবাব দিতে বসে ওর দু চোখ জলভরা হয়ে উঠলো।

সমস্ত কথা খুলে বললে গঙ্গামণি কেষ্টর পাশে বসে। একে একে। সেই হারামজাদা শয়তান মিন্‌সেটা ভুলিয়ে ভালিয়ে ভাতের লোভ দেখিয়ে তাকে শহর থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলো। হেথায় হোথায় করে কাটালো কিছুদিন। তারপর একদিন পালিয়ে গেলো। গঙ্গামণি একা। বিদেশ বিভুঁয়ে, গ্রামে গ্রামে পথ ঘাট মাঠ করে ও ঘুরে বেড়াতে লাগলো ভিক্ষে চেয়ে চেয়ে, ভাতের জন্য হাত পেতে পেতে। গাঁয়ে গাঁয়ে ধানের গোলা আজও শূন্য, আজও আকাল মেটেনি। পেটের তাড়ায় ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত গঙ্গামণি এসে উঠলো হাতামোড়ায়। সেইখানেই ছিল গঙ্গামণি আজ দু—দু মাস। চাঁপাদের কাছেই। ওদের কথায়, ওদের সাথেই এই মেলায় এলো, শালবনীর মেলায়।

কথার শেষে গঙ্গামণি কেষ্টর হাত জড়িয়ে ধরে কাকুতিতে কেঁদে উঠলো।

—আর লারি, কিষ্টো। ব্যাধি হলো শরীলে, বল নাই। এ জ্বলন সামলাতে লারি। তুর সাথে লিয়ে চল আমায়।

হাত সরিয়ে দিলে না কেষ্ট গঙ্গামণির। কান পেতে শুনলো সব কথা। প্রথম আলাপের সেই হাসি মরমে গাঁথা ছিলো, এবার গাঁথা হলো এই অনুনয়। নিরুত্তরে কেষ্ট শুধু তাকিয়ে থাকলো মন্দিরের দিকে। শেষ রাতের দুধ-আলো চূড়ো-ভাঙ্গা, শ্যাওলা-মাখা মন্দিরের গায়ে গা মিশিয়ে দিয়ে যেন নিঃসাড়ে সোহাগ জানাচ্ছে।

ভোর হলো। সূর্য ওঠার মুখে মুখেই গঙ্গামণি চাঁপার শাড়ি, জামা চুপিসারে ফেলে রেখে এক্কায় এসে উঠলো। পাশে কেষ্ট। গঙ্গামণির দিকে তাকালো কেষ্ট। ভোরের আলোয় গঙ্গামণি ছেঁড়া-ফাটা, চিট্-নোঙরা শাড়িতে গা গতর ঢেকে এসেছে কায়ক্লেশে। শীতের হাওয়ায় কাঁপছে ঠক্‌ঠকিয়ে।

সেদিক পানে তাকিয়ে তাকিয়ে কেষ্ট প্রথমটায় কেমন যেনো অবাক্, তারপর অদ্ভুত একটা বেদনায় মন ভার হয়ে বসে থাকলো।

কেষ্টর চোখে গঙ্গামণির লুকোনো লজ্জাটা ধরা পড়ে গেছে। ছেঁড়া-ফাটা শাড়ির আঁটুনীতেও ঢাকা পড়েনি সে কলঙ্ক চিহ্নটা।

এক্কা ততক্ষণে এগিয়ে চলেছে পলাশবনীর পথ ধরে। লাল ধূলো উড়ে পথের পাশে পলাশ আকন্দের পাতায় রঙ ধরাচ্ছে ধূসর। শূন্য প্রান্তরে একটানা ঘন্টি বাজছে ঘোড়ার গলায় বাঁধা ঘন্টিগুলোর। সামনে পিছনে আরও কতো এক্কা, কতো মেলা ফিরতি মানুষ-জন।

এক্কার ঝাঁকুনি খেতে খেতে সহসা কেষ্ট বুঝতে পারলো সাজনীর সাজে সেজে এসেও গঙ্গামণি কাল রাত্তিরে পানের মোড়ক বাঁধা আঁচলের গিঁট খুলতে পারেনি কেন।

আবার সেই চাঁচুরিয়ায় ফিরে এলো গঙ্গামণি। এসে দেখে, অবস্থার হেরফের তেমন কিছু হয়নি। মরে, পালিয়ে বেঁচে-বর্তে শেষ পর্যন্ত যারা টিকে গেছে তারা প্রায় সকলেই ঠাঁই নিয়েছে ওভারব্রীজের নীচে, এক্কা স্ট্যাণ্ডের ছাউনীর তলায়। ঘোড়ায়, কুকুরে, মানুষে মিলে-মিশে রাতটুকু নিশ্চিন্তে ওরা কাটিয়ে দেয়। ভোরের মুখ দেখার সাথে সাথেই যে যার মত বেরিয়ে পড়ে পথে।

গঙ্গামণিও এসে মাথা গুঁজলো সেই ছাউনীতে।

আসার পথেই কেষ্ট সাবধান করে দিয়েছে গঙ্গামণিকে। খবরদার, দিনের বেলায় রেস্টুরেণ্টের আশে পাশে গঙ্গামণি যেন ঘুরঘুর না করে। রাত্রে সেই আগের মতই গলিপথ দিয়ে লুকিয়ে গিয়ে পিছন দরজায় এসে ডাক দিলেই হবে। সজাগ থাকবে কেষ্ট।

এবার আর কেষ্টর কথা অমান্য করতে সাহস করলো না গঙ্গামণি। সারা দিন পরে সিকিপেটা, আধপেটা যাই হোক, যেমন হোক খাবারটা জোটে কেষ্টর কাছেই। তা কি বন্ধ হতে দেওয়া যায়?

খুব সাবধান হয়েছে এবার গঙ্গামণি। যতক্ষণ দিনের আলো আছে, বাজার-পথে ওর ছায়া দেখবে না কেউ। সারা দিন লাইনধারে, স্টেশনে, প্যাসেঞ্জার গাড়ির কামরায় কামরায় ভিক্ষে চেয়ে বেড়ায়।

রাত হলে ওর পা আর বাধা মানতো না। বাজারে ঢুকতি-পথে অন্ধকার মত একটা জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

তাকিয়ে থাকতো রেস্টুরেন্টের দিকে। কতোক্ষণে ভিড় কমে, মালিক চলে যায়, দোকানের দরজা বন্ধ করে দেয় কেষ্ট। অগ্রহায়ণের হিমে গঙ্গামণির সর্বাঙ্গ কনকনিয়ে আসে—তবু পা নড়ে না, চোখ ফেরে না অন্যদিকে। রেস্টুরেন্টের বাতিটা নিভে যাবার অপেক্ষায় তার দু চোখ ঠায় জেগে থাকে।

রেস্টুরেন্টের বাতি নিভে গেলে পা-পা করে গঙ্গামণি গলির পথ ধরে। ছাই, জঞ্জাল, ফণিমনসা ঢাকা এক-মানুষ-গা অন্ধকার গলি। সেই গলি দিয়ে নিঃশব্দে পা টিপে টিপে গঙ্গামণি রেস্টুরেন্টের পিছন দরজায় এসে থামে। জালের ফুকরি দিয়ে উঁকি মারে। আস্তে আস্তে ডাকে—'কিষ্টো, উ কিষ্টো।'

কেষ্ট সজাগ। ডাক শুনে গঙ্গামণির জন্যে লুকিয়ে রাখা খাবার হাতে জালের ফুকরির কাছে এসে দাঁড়ায়।

কালিঝুলি মাখা জালের ফুকরির গায় গঙ্গামণির জ্বলজ্বলে চোখ দুটো বেড়ালের চোখের মত জ্বলতে থাকে। হাপর-টানার মত শব্দ ওঠে ওর নিঃশ্বাসের। আবছা একটা ছায়া জালের ওপাশে মুখ ঘষে।

লুকিয়ে রাখা পাত্রটা ঝট্‌পট্ টেনে নেয় কেষ্ট। ফাঁক দিয়ে গঙ্গামণির থালায় উজাড় করে ঢেলে দেয় সঞ্চিত খাদ্যবস্তুগুলো।

কথা বলার অবসর নেই গঙ্গামণির। অন্ধকারেই একটা হাত তার থালা থেকে মুখে এসে উঠেছে।

চুপ—সব চুপ। দূরে কুকুর ডাকছে। কেরাসিনের লালচে আলোয় রেস্টুরেন্টের মধ্যে দাঁড়িয়ে কেষ্ট। বাইরে অন্ধকার।

আবর্জ্জনার গন্ধ ভাসছে। খেতে খেতে গঙ্গামণির গলা বন্ধ হয়ে আসে, বিষম লাগে। কাশির দমকে বুক ছিঁড়ে যাবার যোগাড়।

ধমক দেয় কেষ্ট। ধরা পড়ার ভয়ে ওর গা ছম্‌ছম্‌ করে। তাড়াতাড়ি জল দিয়ে বিদেয় করে দেয় গঙ্গামণিকে।

নিত্যই এই। কোনো রকমফের নেই। রাত্রে নিদেনপক্ষে একটি দুটি কথা হয়। নয়তো সব কিছুই চুপি চুপি ; নিঃসাড়ে।

কথার পাট দিনের বেলায়। কাজের ফাঁকে কেষ্ট স্টেশনে এলে।

দেখতে দেখতে অগ্রহায়ণ শেষ হলো। পৌষ এলো শীতের প্রচণ্ড দাপট নিয়ে। সে পৌষও শেষ। মাঘ মাসে গঙ্গামণি এক্কা স্ট্যাণ্ডের ছাউনীর তলায় শীতের রোদ্দুরে চুপচাপ বসে থাকে আর হাঁপায়। গায়ে বল পায় না। প্যাসেঞ্জার ট্রেন এলে কোনরকমে শরীরটাকে টেনে-টুনে প্লাটফর্ম পর্যন্ত নিয়ে যায়। তাও যেনো পারে না রোজ। মাথা ঘোরে চরকিপাকে, দম বন্ধ হয়ে আসে, হাঁপ ওঠে। চড়চড়িয়ে টান পড়ে পেটে, পেট মোচড় দিয়ে ওঠে। গা গুলোয়, মাথা গুলোয়।

শরীরটা যতোই নিস্তেজ হয়ে আসে, ততই যেনো গঙ্গামণির পেটের খিদে জিভ ঠেলে বেরিয়ে আসে। কুকুরের মত পাত চেটে বেড়ায় ও এক্কা স্টাণ্ডের এখানে ওখানে।

এদিকে রেস্টুরেণ্টে জোর রেষারেষি বেধে গেছে কারিগর আর কেষ্টতে। ক্যাশ থেকে টাকা চুরি করেছিলো কারিগর। ধরা পড়ে দোষ চাপালো কেষ্টর ঘাড়ে। তা ছাড়া বেশ খানিকটা

হাত টান ছিলো কারিগর ছোকরার। ধরা পড়লেই কেষ্টকে কোনঠাসা করে দিতো। বাবুকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতো, 'হবে না কেনো মালে কমতি? সেই শালি তো আবার এসেছে—পিরীতের বোষ্টমী কেষ্টার। উর পাতেই তো যায়।'

গোলমেলে ব্যাপার দেখে কেষ্ট গঙ্গামণির আসা বন্ধ করে দিলে। বললে, 'ঝামেলা বাঁধাইছে রে; গঙ্গামণি। উ শালা লটবরের শয়তানি সব। তুই আর আমার ঠেঙে রেতে যাস নে। থাক্ হেথায়। লুকাই চুরাই দিব ক্যানে কিছু।'

সেই থেকে গঙ্গামণির ভুকুল যেতে বসলো। দুর্বল শরীর নিয়ে বসে থেকে পাত চাটলে পেট ভরে না; কেষ্টর প্রত্যাশায় পথ চেয়ে চেয়ে হদ্দ হয়ে গেলেও তেমন কিছু জোটে না আজকাল। রোজ তো নয়ই। বাধ্য হয়েই গঙ্গামণিকে এবার স্টেশন বাজার সর্বত্রই ককিয়ে, কেঁদে, হাতে-পায়ে ধরে পেটের জ্বালা মেটাবার চেষ্টায় বেরোতে হলো।

আরও কিছুদিন কাটলো এইভাবেই। গঙ্গামণি আর পারে না। শরীরে কুলোয় না একেই, তায় আবার যা জোটে এঁটোকাঁটা তাতে ওর অরুচি।

কেষ্টর সঙ্গে পথে-ঘাটে দেখা হলেই গঙ্গামণি ওর পথ আটকে ধরে।

—আর তো লারি রে, কিষ্টো। ভাল্, তুই—ভাল্। 'দয়ামায়া কুথায় গেল রে তুর? ই শরীলে আমার থাকলো কি ক?'

কেষ্ট চুপটি করে সব শোনে। কথা বলার মত কিছু খুঁজে পায় না। কিই বা আছে বলার !

আর একদিন দেখা। প্লেট-ঢাকা খাবার নিয়ে কেষ্ট যাচ্ছিলো স্টেশনে, বুকিং অফিসে।

—যাস কুথায় রে, কিষ্টো ? গঙ্গামণি পথ আড়াল করে দাঁড়ালো, 'কি আছে রে উতে ?'

—চপ্। জবাব দিলে কেষ্ট, 'টিকিটবাবুর চেনা-জানা লোক এলো। অর্ডার দিলেক্।'

চপের প্লেটের দিকে লোভার্ত দৃষ্টিতে গঙ্গামণি তাকিয়ে থাকলো, 'মাসের চপ্, না কি রে ?' জিভে জল এসে পড়েছে ওর।

—হাঁ ; মাসের। কেষ্ট পা বাড়ালো।

—শুন্, শুন্ কিষ্টো ;—টিকিটবাবুরা সবটাই কি খাবেক আর ? টুকচা ফেলাছাড়া থাকলে দিস ক্যানে আমায়। আমি হেথায় আছি। গঙ্গামণি চপের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে যেনো অবশ হয়ে এলো।

চলে গেলো কেষ্ট চপের প্লেট হাতে নিয়ে।

কিন্তু ছাড়া পেলে না। সেই থেকে গঙ্গামণির সাথে দেখা হলেই ও নাছোড়বান্দা।

—উ কিষ্টো। খাওয়া ক্যানে একটা চপ্ রে ? কতোই তো হয় তুদের রোজ। বড্ড সাধ লাগে—। ই জিবে আর সোয়াদ নাই রে। পায়ে পড়ি কিষ্টো তুর, একটা মাসের চপ খাওয়া আমায়।

কেষ্ট কতো বোঝায়। বলে, বড় কড়াকড়ি রে, গঙ্গামণি। মালিক নিজের হাতে সব গুণে রাখে, হিসেব নেয়। চপ্ তোকে খাওয়াই কি, করে? একটু সবুর কর, ফাঁক পেলেই খাওয়াবো।

গঙ্গামণির কপাল ভালো। অল্প ক'দিনের মধ্যেই হঠাৎ একটা সুযোগ জুটে গেলো। মাঘের শেষ তখন। বাজারে আলুর আড়ৎ যার সেই নন্দীবাবুদের মেয়ের বিয়ে। দু হাতে পয়সা ঢেলে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে নন্দীবাবু। বোষ্টম লোক। বাড়িতে মাছ মাংস একেবারেই অচল। অথচ বরযাত্রীদের জন্যে খাবার ব্যবস্থাটা মাংসের পর্যায়ে না তুললেই নয়। মদন বাবুর রেস্টুরেন্টে ঢালাও অর্ডার হলো মাংস আর চপের।

মাঘের প্রচণ্ড শীত। বিয়ের লগ্ন মাঝ-রাতে। সেই দুরন্ত শীতে নিমন্ত্রিতদের পাতে গরম চপ্ আর মাংস তুলে দেওয়ার পাট চুকোতে-চুকোতে বিয়ের লগ্ন পেরিয়ে গেলো। ক্লান্ত মদন-বাবু বিদায় নিলে। চলে গেলো কারিগর গামছার একটা মোটা রকমের পুঁটুলি বেঁধে। রেস্টুরেন্টের ধোয়ামোছা শেষ করে কেষ্ট উনুনটায় কয়লা ঢেলে দিলে। রাত তো প্রায় শেষ হতে চললো। ভোর না হতেই গরম জল দরকার চায়ের।

হাতমুখ ধুয়ে অল্প একটু বিশ্রাম নিলো কেষ্ট। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীতে সমস্ত শরীরটা অবসন্ন হয়ে এসেছে। পর পর দুটো বিড়ি খেয়ে হাই তুললো। ঘুম পাচ্ছে ওর; ভীষণ ঘুম। রাতের গোড়ায় জোর খিদে পেয়েছিলো; এখন আর দাঁতে কুটো কাটতেও ইচ্ছে করে না।

বেঞ্চি জোড়া দিয়ে কেষ্ট তার বিছানাটা বিছিয়ে নিলো রেস্টুরেন্ট ঘরে। একটা কালো ময়লা পর্দা ঝুলতো রেস্টুরেন্টের রান্না ঘর আর এই চেয়ার টেবিল সাজানো ঘরের মধ্যে। পর্দাটা গুটিয়ে দিলে কেষ্ট। উনুনে আঁচ উঠে গেছে। এই প্রচণ্ড শীতে ওই আঁচের তাপটা বেশ লাগে।

চায়ের জল-গরমের টিনটা উনুনে চাপিয়ে জল ভর্তি করে দিলো। ফুটুক এখন।

ঠিক এমন সময়ই জালের খড়খড়ি দিয়ে ডাক শোনা গেল, 'কিষ্টো—উ কিষ্টো।'

এই ডাকেরই অপেক্ষা করছিলো কেষ্ট। গঙ্গামণিকে আজ সে আসতে বলেছে। হৈ-হট্টগোলের মধ্যে না হলে আর সুযোগ জুটতো না। কতদিন মেয়েটা একটা চপের জন্যে বায়না ধরেছে, মাথা খুঁড়ছে কেষ্টর পায়। খদ্দেরের এই রাশি রাশি খাবারের মধ্যে ও যদি দুটো খায় কেউ জানতে পারবে না, ধরতে পারবে না। বেচারী গঙ্গামণি। কতোকাল পেট ভরে খায়নি, কতোদিন ওর মুখে এঁটোকাঁটা আর নোংরা ছাড়া কিছু ওঠেনি। কেষ্টর ভরসা পেয়েই গঙ্গামণি এখানে এসেছিলো এবার, এই চাঁচুবিবায়—কিন্তু কেষ্টও পারলো না। পারলো না গঙ্গামণিকে নিত্য একবেলা এক মুঠিও হাতে তুলে দিতে।

জালের খড়খড়ির পাশে পিছন-দরজা। সেই দরজাটার খিল খুলে কেষ্ট ডাকলো, 'আয়—ভেতরে আয়।'

গঙ্গামণিকে দ্বিতীয়বার বলতে হলো না। অন্ধকারের গুহা

থেকে লোভার্ত একটা ভীরু পশু যেনো ঘরে এসে ঢুকলো। শীতের দাপটে কাঁপছে হি হি করে।

কেরোসিনের খুপির আলোয় সেই ফোলা ফোলা বীভৎস মূর্তির দিকে তাকিয়ে কেষ্ট আবার দরজার খিল এঁটে দিলো।

—রাতটো শেষ করেই এলাম রে। গঙ্গামণি এক কোণে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তীক্ষ্ণ চোখে নজর করছে।

—ভালোই করলি। কেষ্ট কি যেনো ভাবলো একটু। তার নিজের পাত্রটা টেনে নিলে দেওয়াল-তক্তা থেকে। গঙ্গামণির জন্যে লুকিয়ে রেখেছিলো ছুটো চপ, ক' হাতা মাংস।

খাবারের পাত্রটা এগিয়ে দেবার আগে কেষ্ট বললে, 'শীতে তুই বড় কাঁপছিস্ গঙ্গামণি, একটু আগুন পুইয়ে নে। না হলে খাবি কি, কেঁপেই মরবি।'

—আগ্ সেঁকে কাজ নাই। তু দেখ ক্যানে—আমি হদ হদ করে খেয়ে লিব। সারা রাত ঠায় চোখ ফাবড়ে বসে আছি ত' বসেই আছি। ই বাবা, এতো কি যজ্ঞি রে কিষ্টো, মানুষগুলা খায় তো রাত ভোর করেই খায় সব।

গঙ্গামণি অধৈর্য হয়ে আঁচল পাতলো।

—লিতে হবে না। বোস্ তুই, উখানেই বোস্। বোসে বোসে খা।

কেষ্টর কথায় গঙ্গামণি বোধ হয় একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলো প্রথমটায়। কিন্তু অতোশতো ভাববার সময় নেই তার। পেট থেকে জল টানছে জিবে। মাটিতে বসে পড়লো গঙ্গামণি।

হাতের পাত্রটা কেষ্ট এগিয়ে দিলো। সেদিক পানে তাকিয়ে

গঙ্গামণির চোখের পাতা আর পড়তে চায় না। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে থাকে, হাঁ হয়ে থাকে মুখ। জিভ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে ঘি-ভাতের ওপর।

বিয়ে বাড়িতে পরিবেশন শেষ করে আসার পথে কারিগর নটবর ওদের ভাগ নিয়ে এসেছিলো—লুচি, মাছ, ঘিভাত কতো কিছু। কেষ্টকেও দিয়ে গেছে খানিক খানিক। সবই তোলা ছিল। কেষ্ট থালাটাই এগিয়ে দিয়েছে গঙ্গামণিকে। এর ওপর মাংস আর চপ।

জীবনে কোনদিন এত খাবার দেখেনি গঙ্গামণি। জিভে স্বাদ জানে না অনেক কিছুরই। কোন্‌টা কি, মিষ্টি না ঝাল, টক্‌ না নোনতা, কিছুই তার জানা নেই। কোন্‌টা আগে ছোঁবে, কি যে আগে খাবে—গঙ্গামণি তা ভেবেই পায় না। চোখ দুটো তার থালার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকে।

কেষ্টর তাগিদে গঙ্গামণির বিমূঢ় ভাবটা কাটলো।

হাত বাড়ালো গঙ্গামণি। ভাতে মিষ্টি কেন রে কিষ্টো? নুন ক্যানে ইয়াতে? মাগো মা, ঘিয়ে চপ্‌চপায়। ক্যাওটের বিটি আমি, বাপের কালেও মাছের সোয়াদ জান হল না ইর পারা রে কিষ্টো। কী স্বয়াদ—জিভে জড়াই যায় গ'!

বিড়ি ধরিয়ে কেষ্ট একদৃষ্টে তাকিয়েছিলো গঙ্গামণির দিকে। গঙ্গামণিকেই সে দেখছে। দেখার মতই না দৃশ্যটা। পা ছড়িয়ে, মুখ থুবড়ে থালার ওপর লুটিয়ে পড়েছে গঙ্গামণি। হাতের আঙুলগুলো তার পাগল হয়ে ছুটোছুটি করছে পাতের ওপর। বিরাম নেই গ্রাস আর গলাধঃকরণের। চোখ তুলে চায় না—

সোজা করে না দেহটাকে। অদ্ভুত! অদ্ভুত দেখাচ্ছে গঙ্গামণিকে। দু-পাঁচ ক্রোশ ছুটে আসার পর ঘাড়-মুখ গুঁজে ঘোড়াগুলো ঠিক এমনিভাবেই দানা খায় না!

দৃশ্যটা কে জানে কেন, কেষ্টর ভালো লাগছে না। এমন হবে জানলে গঙ্গামণিকে ঘরের মধ্যে ডেকে নিতো না; খাওয়াতো না চোখের সামনে বসিয়ে। কি যে খেয়াল হয়েছিলো কেষ্টর, ইচ্ছে জেগেছিলো ভীষণ—গঙ্গামণিকে সামনে বসিয়ে ভালোমন্দ দিয়ে পেটপুরে খাওয়াবে। এই প্রচণ্ড শীতে ঘরের মধ্যে উনুনের আঁচের আরাম কি কম! সেই আরামে নিশ্চিন্তে বসে গঙ্গামণি ধীরে ধীরে খাক্ না কেন সব—যত তার পাতে আছে।—খাওয়ার খুশীতে গঙ্গামণির মুখে আনন্দ উপচে উঠুক, ক্ষুধা-তৃপ্তির সেই আরাম আর সুখ, যে আরাম, সুখ ও ভুলে গেছে অনেক কাল, অনেক শীত আগেই। অনেক সাধ ছিলো কেষ্টর, প্রবল বাসনাই, গঙ্গামণির সেই খুশী, পরিতৃপ্ত, চরিতার্থ মুখখানি আজ ও দেখবে। আর সেই সঙ্গে একথাও বুঝুক গঙ্গামণি, কেষ্ট নিরুপায়; নয়তো গঙ্গামণিকে খাওয়াতে তার কি কিছু কম সাধ?

কিন্তু কই খাওয়ানোর সেই সুখ পাচ্ছে না তো কেষ্ট। গঙ্গামণির মুখ-ঘাড় গুঁজে বসা ওই দেহের কোথাও কি খাওয়ার আনন্দ আছে, কী সুখ?

আশ্চর্য! কেষ্ট অবাক মানছে মনে মনে। অপদেবতারা সূর্যের আলো মুছে দেয়, গাছের সবুজ পাতা এক নিঃশ্বাসে ঝরিয়ে ফেলে, সমুদ্রের জল শুকিয়ে অগুনের ঝড় তোলে, ভীষণ

ঝড়; তেমনি কি—তেমনি কি, আকালের ঝড় মানুষের মুখ থেকে খাওয়ার খুশীও মুছে নিয়ে গেলো।

সেদিকে পানে তাকিয়ে তাকিয়ে বেলসেবুবের সাত অনুচর—সাত অপদেবতাকে কেষ্ট যেনো হঠাৎ রেস্টুরেন্টের এই ঘরে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলো। অনুভব করতে পারলো তাদের বিষনিঃশ্বাস। সেই তীব্র কটু গন্ধকের হাওয়া দিয়েছে আবার। পুরোনো চাঁচুরিয়া আর গঙ্গামণি, গঙ্গামণির দল মনের নাগর-দোলায় ওঠানামা করছে।

কে? কেষ্ট চমকে উঠলো। পাত থেকে হাত গুটিয়ে গঙ্গামণিও তাকালো চোখ তুলে।

রেস্টুরেন্টের বাইরের দরজায় ভীষণ জোরে ধাক্কা মারছে কে! কান পেতে শব্দটা শুনতেই কেষ্টর মুখ শুকিয়ে এলো। ঢিপ ঢিপ করে উঠলো বুক।

বাইরের দরজায় ধাক্কা মারার শব্দটা থেমেছে। গঙ্গামণি তখনো পাত আগলে বসে। মাংসটা তবু একটু খেয়েছে, কিন্তু বড় সাধের চপ দুটো তখনো তার পাতে। তারিয়ে তারিয়ে খাবে শেষ-পাতে, সেই ইচ্ছেতেই একপাশে সরিয়ে রেখেছিলো।

ইঙ্গিতে কেষ্ট গঙ্গামণিকে উঠতে বললে চটপট। ফিসফিসিয়ে জানালো, পিছু-দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতে।

মাংস আর চপ ছেড়ে পালিয়ে যেতে মন চাইছিলো না গঙ্গামণির। চুপি গলায় সে বললে, 'ডরাস ক্যানে? উ কিছু লয়। বাতাস হবেক, কি কুকুর-টুকুর?'

দরজায় ধাক্কা মারছে না আর কেউ। শব্দ নেই কোথাও।

কেষ্ট অপেক্ষা করলে। তবে? ওকি বেলসেবুব? কেষ্টর ভয় কমলো না, এতটুকুও।

—কাজ'কি ঝামেলায়? তুই যা গঙ্গামণি।

প্রচণ্ড অনিচ্ছা, তবু গঙ্গামণিকে যেতে হবে। রাগ হলো তার খুব। চপ্ দুটো চট করে তুলে নিলো। একটা কামড় বসিয়ে গরগর করতে লাগলো রাগে আর বিরক্তিতে।

আস্তে আস্তে খিল খুললো কেষ্ট পিছন-দরজার। কপাটের একটু ফাঁক দিয়ে এক চিলতে অন্ধকার চোখে ঠেকেনি তখনো, হঠাৎ কে যেনো বাইরে থেকে দড়াম করে এক লাথি মেরে কপাট দুটো হাট করে দিলো।

কপালে ঠোক্কর লাগলো কেষ্টর, জোর ঠোক্কর কপাটের। ঝিম ঝিম করে উঠলো মাথাটা।

কপালে হাত বুলোতে বুলোতে কেষ্ট এক চোখে চাইলো। সেই চাওয়াতেই তার সর্বাঙ্গ অসাড়, পাথর হয়ে যায়। স্বপ্ন নয়, নটবরও নয়, বাবু স্বয়ং—মদনবাবু। একেবারে দরজার ওপরেই।

মদনবাবু এক নজরে সব দেখে নিলেন। আগেও দেখেছেন জালের ফুকরি দিয়ে।

পিছন দরজার কপাটটা বন্ধ করে খিল তুলে দিলেন মদনবাবু। ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা টিপে ধরলেন কেষ্টর।

—নেমক্‌হারাম, জোচ্চোর, সোয়াইন—আমার ব্যাগ্ কোথায় বল? তারপর দেখছি সব—

দম বন্ধ হয়ে আসার যোগাড় হয়েছিলো কেষ্টর। মদনবাবুর হাত থেকে গলা ছাড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো কেষ্ট।

গলা দিয়ে দমবন্ধ হবার মত ঘড়ঘড় শব্দ উঠলো ।

গলা ছেড়ে দিলেন মদনবাবু ।

দম নিতে লাগলো কেষ্ট। গলা তার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। মুখ পাংশু।

—কোথায় আমার ব্যাগ? মদনবাবু এক থাপ্পড় লাগালেন কেষ্টর গালে।

দু-পা হঠে আসতে হলো কেষ্টকে।

—জানি না, বাবু।

—শালা, শুয়ার, ব্যাগ জানো না তুমি? জানাচ্ছি, দাঁড়াও!

কেষ্টর চুলের মুঠি নেড়ে আর এক থাপ্পড় কষালেন তার গালে। কেষ্ট দেওয়ালের গা ঘেঁষে ছিটকে এলো।

এক লাফে মদনবাবু এগিয়ে গেলেন ক্যাশের দিকে। ক্যাশের চাবি খোলা। টানাটা উঠোতেই ব্যাগটা হাতে ঠেকলো। নিত্যদিন যেভাবে ব্যাগটা পড়ে থাকে, ঠিক সেইভাবেই পড়ে আছে। যথেষ্ট ভারী। হ্যাঁ, নন্দীবাবুর টাকায় ভারী হয়েছিলো বলেই না এই শীতের শেষরাতে ব্যাগের কথা মনে পড়লো বিছানায় শুয়ে। আর যেই-না মনে পড়া ছুটতে ছুটতে তিনি এলেন দোকানে। হাজার কাজে, ভিড়ে, বিয়ে বাড়ির খাবার পাঠানোর তদারকে কখন যেন ভুলেই ব্যাগটা দোকানে রেখে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। মনে পড়তেই ছুটে এলেন। বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা দিলেন। কোন শব্দ নেই। এলেন পিছন-দরজায়। জালের

ফুকরি দিয়ে তাকালেন অন্দরে। ঘুমন্ত কেষ্টকে ডাক দেবেন বলেই। কিন্তু তাকিয়ে যে দৃশ্যটা চোখে পড়লো তাতে আপাদ-মস্তক জ্বলে উঠলো মদনবাবুর। নটবরের কথাই তা হলে ঠিক। এমনিভাবে কেষ্ট রোজ তাঁর দোকানের খাবার চুরি করে ছুঁড়িটাকে খাওয়ায়। টাকা-পয়সাও যে আজকাল ক্যাশ থেকে মাঝে মাঝে চুরি যায়—সেটাও তাহলে কেষ্টর কীর্তি! বিশ্বাস কি? আর ব্যাগ? ব্যাগটাও কি তিনি সত্যি ভুলে দোকানে ফেলে গেছেন না হাতিয়ে নিয়েছে কেষ্ট? পলকে তাঁর বিচারবুদ্ধি লোপ পেলো।

ব্যাগটা হাতে করেই মদনবাবু আবার কেষ্টর কাছে এসে দাঁড়ালেন। নোটগুলো বের করে গুণে নিচ্ছেন এমন সময় খুট্ করে শব্দ হলো। গঙ্গামণি পিছন দরজার খিল খুলে ফেলেছে। পালাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে সবে।

মদনবাবু ছুটে এসে গঙ্গামণির হাত ধরে ফেললেন।

—শালি, হারামজাদী, লুঠতে এসেছিস এখানে? তোর চোদ্দ ভাতারের জমিদারী এটা। রাখ্—রাখ শীগ্গির চপ্—নামিয়ে রাখ্, ফেলে দে।

হ্যাঁচকা টান দিলেন মদনবাবু। গঙ্গামণি সেই টানে ছিটকে কেষ্টর কাছে গিয়ে দেওয়ালে ধাক্কা খেলে।

ব্যাগটা মদনবাবু ততক্ষণে পকেটে পুরে ফেলেছেন।

গঙ্গামণিও ছাড়ার মেয়ে নয়। তার সেই বহুদিন আগেকার বেপরোয়া ভাবটা হঠাৎ যেনো ভর করলো তাকে। চপ্ সে রাখবে না। হাতের মুঠিটা আরও জোর করে গঙ্গামণি চপ

ধরলো। যেন হাতের মুঠিতে আগলে রেখেছে তার জীবন।

—গাল দিয়ো নাই। থুবো নাই চপ্।

গঙ্গামণি দরজার দিকে আবার এগিয়ে চললো।

মদনবাবু সাপ্টে ধরলেন গঙ্গামণিকে। চপ্ তিনি কেড়ে নেবেনই। রোখ চেপে গেছে। ধস্তাধস্তিতে, কাড়াকাড়িতে গঙ্গামণির চপ্ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মাটিতে ছড়িয়ে ছিটকে পড়লো। বাঁ হাতের চপটা তখনও বাঁচিয়ে রেখেছে ও।

—হেলানী মাগি, চপ্ তোকে রাখতেই হবে। খেতে দেবো না। দেখি কেমন করে খাস তুই। মদনবাবু গঙ্গামণির বাঁ হাত চেপে ধরে মোচড় দিলেন।

—চামার,—কাৎরে উঠে গঙ্গামণি মদনবাবুর বুকের পাশেই কামড়ে ধরলো।

আর্তনাদ করে মদনবাবু হাত ছেড়ে দিলেন। গঙ্গামণি ছুটে পালাতে যাবে, আবার হাত বাড়ালেন মদনবাবু। শাড়ির ছেঁড়া আঁচলটা হাতে এলো। টান দিতেই বাধা পেলো গঙ্গামণি, ছেঁড়া শাড়ি ছিঁড়ে গেল; এক টুকরো তো কাপড়, গা খুলে কোমর খুললো।

সমস্ত জোর দিয়েই বুঝি একটা লাথি মেরেছিলেন পেটে মদনবাবু, গঙ্গামণি তীব্র আর্তনাদ করে ঘুরে পড়লো উনুনের ওপর। হুমড়ি খেয়েই পড়েছিলো গঙ্গামণি। গরম-জল-ভরা টিনটা লাগলো কোমরে—উল্টে পড়লো উনুনের পাশেই। উনুনে জল পড়ে ভ্যাপসা কটু গন্ধ ভেসে উঠলো, বিশ্রী একটা শব্দ হলো আগুনে জল পড়ার। বাকি জলটা গড়িয়ে পড়লো

উনুন বয়ে মাটিতে। গঙ্গামণিও টলতে টলতে লুটিয়ে পড়লো মেঝেতে, অসহ্য কাতরানিতে কঁকিয়ে কেঁদে উঠলো।

কেষ্ট পাথরের মত এক কোণে দাঁড়িয়ে। তার কোন সম্বিত নেই। কাঠের মত দাঁড়িয়ে সে শুধু দেখেই যাচ্ছে। কি ঘটছে তা অনুভব করার বোধটুকুও লুপ্ত তার।

রণশেষে মদনবাবু বিজয়ীর মত দাঁড়িয়ে ক্লান্তশ্বাস ফেলতে ফেলতে গঙ্গামণিকে দেখছেন। নিষ্ঠুর, কদর্য একটা হাসি তার মুখে। চোখ দুটো তখনো হিংস্র, অপ্রকৃতিস্থ।

—চপ্ খাবে—? হারামজাদী মাগী! খা চপ্!

মদনবাবু কেষ্টর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

—আর ব্যাটাচ্ছেলে, রাস্কেল, জোচ্চোর,—তুই! তোর বাপের দোকান এটা? পিরীত করে রাস্তার ছুঁড়ি ধরে এনে চপ্ কাটলেট্ খাওয়াবি? শুয়োরের বাচ্চা, এক আধ দিন নয়—বচ্ছর ধরে তুমি এই রকম চালাচ্ছো।

মদনবাবু কেষ্টকে আরও কয়েক ঘা কষাবার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছিলেন হঠাৎ গঙ্গামণির মর্মান্তিক একটা আর্তনাদ শুনে ঘুরে দাঁড়ালেন। কেমন যেনো মনে হলো! এক পা ঝুঁকে তীক্ষ্ণ চোখে নজর করলেন। কেরোসিনের খুপির লালচে আলোতেও রঙ্ ভুল হলো না। রক্তই। কাপড়ে, উরুতে, মেঝেতে। ফিনকি দিয়ে ছুটছে।

কী বীভৎস! মদনবাবুর সর্বাঙ্গ শিরশিরিয়ে উঠলো। অদ্ভুত একটা ভয় বুকের হাড়ে হাড়ে জমাট বাঁধলো, হৃদপিণ্ডটা যেনো নিজের কানের কাছেই উঠে এসেছে।

পাংশু মুখে মদনবাবু চোখ ফিরিয়ে নিলেন। কেষ্টকেই আবার তাঁর নজরে পড়লো। দু মুহূর্ত আকাশ-পাতাল কি যেনো ভাবলেন মদনবাবু কেষ্টর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। তারপর হঠাৎ মানিব্যাগ্ থেকে কতকগুলো নোট পকেটে পুরে ব্যাগটা তাগ্ করে ছুঁড়ে দিলেন কেষ্টর বিছানার ওপর। অন্ধকারে, কাঁথার ভাঁজে ব্যাগটা হারিয়ে গেল।

—ও! এই—! মদনবাবু কেষ্টর দিকে তাকিয়ে শাসানোর ভঙ্গীতেই কথাটা বলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু গলার স্বরে জোর এলো না, 'এখানে এই সমস্ত হচ্ছে? পেট খসানো! আচ্ছা—দাঁড়াও, ব্যবস্থা করছি তোমার। যাচ্ছি থানায়। মানুষ মারার চেষ্টা! শয়তান—!'

পরমুহূর্তেই মদনবাবু গঙ্গামণির দিকে এক পলক তাকিয়ে পিছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। গলির অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি যে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেন কেষ্ট তা বুঝতে পারলো।

কেরোসিনের খুপির লালচে ম্লান আলোতে রেষ্টুরেণ্ট ঘরের দেওয়াল, বালতি, হাঁড়ি, কুড়ি যেনো তালগোল পাকিয়ে হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে। উনুনের আঁচের আভা যেন আভা নয় একটা চিতাই হবে। তেমনি হিংস্রভাবে তাপ ছড়াচ্ছে ঘরের বাতাসে। কাটা ছাগলের মত লুটোপুটি খাচ্ছে গঙ্গামণি। কী করুণ, অসহনীয়, মর্মান্তিক তার গোঙানি। রেষ্টুরেণ্ট ঘরের বদ্ধ বাতাসও সে কান্নায় ককিয়ে উঠেছে।

কেষ্ট পাথর। ভয়ঙ্কর এক জগতে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে সে।

বেলসেবুবের সাত অনুচর—সাত অপদেবতায় ঘেরা এই শ্মশান থেকে পালিয়ে যাওয়ার মত পায়ে জোর নেই তার। ক্ষমতা নেই, এতটুকু। পথ হাঁটতে হাঁটতে কেষ্ট চলে এসেছে সেই মরুভূমিতে, যেখানে ঝড় উঠিয়ে, সাপ ছেড়ে, আগুন বৃষ্টি করে বেলসেবুব ভোজের উল্লাসে মত্ত। গন্ধকের সেই কটু বিষাক্ত হাওয়া ফুলে ফুলে ভুতের নাচ নাচছে। গঙ্গামণির পায়ের কাছে, পেটের কাছে, গায়ে, হাতে, মাথায়। গন্ধকের সেই গরম হাওয়া। ভোজের আগে খানিকটা মাংসই সেঁকে নিচ্ছে নাকি শয়তানরা ?

—কিষ্টো—কিষ্টো রে, আর লারি। উ মাগো, দায়ে গতর কাটে কোন্ চামারে—? পেট কোমর কাটে ; বাঁচারে আমায়। বাঁচা। টুকুন জল দে।

জল ? কেষ্ট তবু খানিকটা সম্বিত ফিরে পেলো এই জল চাওয়ায়। গেলাসে করে জল এগিয়ে দিলে গঙ্গামণিকে। জল খাওয়ার চেষ্টা করলে গঙ্গামণি, পারলে না। আবার লুটিয়ে পড়লো। বাঁ হাতের মুঠিতে তখনো তার আধখানা চপ্।

গঙ্গামণির কটিতটের দিকে এতোক্ষণে ভালো করে চাইলো কেষ্ট। দু হাতের ব্যবধান থেকে। চেয়েই চোখ বন্ধ করলে। সর্বাঙ্গ শিহরিত হবার অস্ফুট একটা শব্দ শোনা গেল তার জিবে আর ঠোঁটে। মাথাটা কেমন ঘুরে গেলো। পিছু হঠে ধপ করে বসে পড়লো কেষ্ট দু হাতে মুখ ঢেকে।

হঠাৎ একটা ডাক ছাড়া, ডুকরে ওঠা কান্নার শব্দে চমকে উঠে কেষ্ট তাকালো গঙ্গামণির দিকে। আথুলি পিথুলি থেমে

গেছে গঙ্গামণির। কাটা ছাগল যেমন শেষ ডাক দিয়ে থেমে যায়, তেমনি।

কেষ্টর সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে গেল সেই মুহূর্তেই। বিস্ফারিত, নিস্পলক-নয়ন, বিমূঢ় চিত্ত সে। পরমাশ্চর্য একটি জীবনকে সে দেখতে পেয়েছে। কেরোসিনের লালচে বিবর্ণ আলোয় অস্পষ্ট একটা মাংসপিণ্ডকে। কোন্ যাদুবলে হঠাৎ গঙ্গামণির জানুদেশে এসে ঠাঁই নিলো এ প্রাণ, এই পিণ্ড? বুকের ওপর দিয়ে যেন রেল গাড়ীর চাকা চলে যাচ্ছে কেষ্টর। অব্যক্ত যন্ত্রণা আর গুরু গুরু। দেহের সমস্ত রক্তবিন্দু পাগল হয়ে হৃদপিণ্ডের কাছে ছুটে আসছে।

আলোছায়ার সেই অতল রহস্যের পাতায় গঙ্গামণির শত নাড়ির রক্তের আল্পনা আঁকা ছিলো—অদ্ভুত আল্পনা, সেই আল্পনার স্নেহ-পিঁড়িতে নিশ্চিন্ত একটি প্রাণ নিঃশব্দে পড়ে থাকলো।

গঙ্গামণি একটু থেমে একবার উঠে বসার চেষ্টা ক'রে কাতরে, ককিয়ে আবার নেতিয়ে পড়লো।

ছটফট করছে কেষ্ট। পায়চারি করছে পাগলের মত। গঙ্গামণি নিশ্চল, নিস্পন্দ। তবে কি সে মরে গেল? চলে গেল এই পিয়াজ-রসুনের গন্ধভরা বদ্ধ রেষ্টুরেণ্ট ঘরের দেওয়াল ডিঙিয়ে, ওই ফুকরি কাটা জালের মধ্যে দিয়ে বাইরের হাওয়ায়—আকাশে?

বিমূঢ় কেষ্ট কি করবে বুঝতে না-পেরে এক মগ জল নিয়ে গঙ্গামণির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ঠক্ ঠক্ করে তার পা

কাঁপছে, হাত কাঁপছে। খানিকটা জল ছলকে পড়ল গঙ্গামণির পেটে, পায়ে—সগুজাতের গায়ে। বাকি জলটা কেষ্ট গঙ্গামণির মুখে মাথায় ঢেলে দিয়ে হাঁপাতে লাগলো।

দেখছে কেষ্ট। দেখছে এক মনে; দু চোখে অজস্র মমতা আর উদ্বেগ ভরে, গঙ্গামণি একটু কেঁপে ওঠে কি না! আর একবার কাতরে ওঠে কি না!

গঙ্গামণি কেঁপেই উঠলো। আর হঠাৎ—হঠাৎ সেই অস্পষ্ট মাংস পিণ্ডটা কোন্ অজেয় শক্তি বলে কেঁদে উঠলো এতোক্ষণে, এই প্রথম, দুর্বল, অসহায় গলায়।

কেষ্টর সর্বদেহ শিহরিত হলো সেই কান্নার শব্দে। আরও বিহ্বল, বিমূঢ় হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো ও। যেনো বনের পথে পথ-ভুলে হাতড়ে মরছে একটা আলোর নিশানা।

কেমন করে যেনো অকস্মাৎ, অতর্কিতে কেষ্টর চোখ পড়লো দেওয়ালে আঠা দিয়ে আঁটা সেই ধূলি-ধোঁয়া-মলিন, বিবর্ণ যীশুর ছবির ওপর। চোখ পড়ে তো থমকেই থাকে, নড়ে না আর। কেষ্ট যেনো মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে। আজ এই মুহূর্তে কেমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে ছবিটা! উনুনের আঁচের লাল আভার খানিকটা তির্যক রেখায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে ছবির গায়—সেই আভায় যীশু আজ আলোকিত।

কেষ্ট পলকহীন। চোখে তার অগাধ বিস্ময়। মন তার হাওয়ায় হাওয়ায় কোথায় বুঝি ভেসে গেছে। মনে পড়ছে অনেক কাল আগেকার একটি দৃশ্য: দোপাটি ফুলের বাগান ঘেরা ইটরঙের কাদামাটির চার্চ। কেষ্টরা গিয়ে বসেছে চার্চের

ভেতর। সাদা লম্বা জামা গায়ে পাদ্রী বুড়ো বাইবেল পড়ছে। চশমাটা নাকের তলায় নামানো। কয়েকটা মোমবাতি জ্বলছে, কাঁপছে তার শিখা। সে আলোয় যীশুর প্রকাণ্ড ছবিটার অন্ধকার ঘোচে না। মুখটা থাকে অস্পষ্ট। পাদ্রী বুড়ো সেই দিকে বার বার চায় আর চাপা গলায় পড়ে,—ঠিক এই রকমই হবে। যখন দেখবে ওই সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটছে তখন নিশ্চিত জানতে পারবে যে, ধর্মরাজ্য হাতের কাছে এসেছে। আমার কথা বিশ্বাস করো। মাটি এবং আকাশ লোপ পেতে পারে কিন্তু আমার কথার অন্যথা হবে না। সে সময় সেই দুর্ঘটনার পর সূর্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে, চাঁদ আর আলো দেবে না, এবং সমস্ত নক্ষত্র আকাশ থেকে খ'সে খ'সে পড়বে। আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডল কাঁপতে থাকবে। তারপর আকাশে মনুষ্য পুত্রের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে। পৃথিবীর সকল জাতি তখন অনুশোচনা করতে থাকবে। তারা দেখতে পাবে, মনুষ্য-পুত্র মহামণ্ডিত হয়ে আকাশের মেঘের ওপর দিয়ে আসছে।

কী এক অদ্ভুত, তীব্র অনুভূতিতে বেদনায় আকুল হয়ে কেষ্ট তাকালো নীচে, রসুন-পিঁয়াজ, মাংস-মশালা এঁটো-কাঁটা ছড়ানো ধোঁয়া-কয়লার কটু বাষ্পভরা রেষ্টুরেন্টের আধো-অন্ধকার মাটির দিকে, গঙ্গামণির রক্ত আল্পনার পাত্রে সাজানো মাংসপিণ্ডটা যেখানে ককিয়ে উঠছে থেকে থেকে।

বিমূঢ়, বিচলিত, বিহ্বল কেষ্ট সেখানে কি যেনো দেখছে, কি যেনো খুঁজছে!

(বরফসাহেবের মেয়ে : : বিমল কর)